সপ্তদশ অধ্যায়

চিত্রাবলী

১

কলিকাতা। গুরুপ্রসাদ চৌধুরীর লেন। ঠাকুরবাড়ির ছাদ। ১৬ই মে ১৯৩১ খ্রীস্টাব্দ, শনিবার। এখন সকাল প্রায় ছয়টা। শ্রীম মাঝখানে পূর্বাস্য বসিয়া আছেন মাদুরের উপর। শ্রীম-র সামনে নবীন দিবাকর। হাওয়াটিও আজ বেশ শীতল। শ্রীম-র ডান দিকে ও বাঁ দিকে টবে ফুলের গাছ। একটি বেল ফুলের গাছও আছে, আর একটি তুলসী। আর কয়েকটাতে পুরীর সমুদ্রোপকুলের ফুল ফুটিয়া আছে। সাধু দুইজন ব্রাহ্ম মুহূর্তে উঠিয়া ধ্যান করিতেছিলেন। এক্ষণে শ্রীম-র কাছে আসিয়া বসিলেন তাঁহার বাম দিকে, দক্ষিণাস্য।

শ্রীম কিয়ৎক্ষণ নবীন ভাস্করের দিকে চাহিয়া ধ্যান করিতেছেন। এইবার ঈশ্বরীয় কথা হইতেছে।

শ্রীম (সাধুর প্রতি) — ঋষিরা এই সূর্যের ভেতর ঈশ্বরকে দেখেছিলেন। সর্বত্রই তিনি আছেন বটে, কিন্তু বস্তুবিশেষে প্রকাশ বেশী। তাই হিন্দুরা সূর্যকে পূজা করে, প্রণাম করে। এঁর ভেতর তাঁকে দেখে বলেছিলেন, 'যোঽসাবসৌ পুরুষং সোঽহমস্মি'। কেবল দর্শন করেন নি। নিজের স্বরূপ উহা, এইটি প্রত্যক্ষও করেছেন। জীবের real (সত্যিকার) রূপ ঐ — অর্থাৎ ঈশ্বর, Divine. অন্য ঋষি এইটিকেই অন্যভাবে বলেছেন অংশাংশীভাবে, — 'অমৃতস্য পুত্রাঃ'। এইটি জানতে পারলে নিজের দৈন্য ঘুচে যায়। তার তো আর কিছু পাবার বাকী নেই! তাই দীনতা হীনতা থাকে না। তাই, আর এক মন্ত্রে বলেছেন, 'আপ্নোতি স্বরাজ্যং'। সম্রাট হয়ে যায়। লৌকিক দৃষ্টিতে হয়তো দরিদ্র, অকিঞ্চন — কিন্তু, পরমার্থ দৃষ্টিতে রাজার রাজা। এইটি মানুষের birth right (জন্মগত অধিকার)। এই কথাটি বলতে এসেছেন ঠাকুর এখন। বিশ্বাস করলেই

প্রায় সব হয়ে গেল। শাস্ত্রে আছে এসব কথা। কিন্তু লোকের বিশ্বাস হয় না। কারো জীবনে দেখতে চায়। তাই অবতার হয়ে আসেন ভগবান। এসে দেখান যে শোক তাপ, দুঃখ দারিদ্র্য, জরা মৃত্যুতে 'আমি অভিভূত নই'। মাথা ঠাণ্ডা রেখে চলেন এই সবের ভেতরও। সংসারের relationship (আত্মীয়তাও) স্বীকার করেন, but in a subordinate sense (কিন্তু গৌণ অর্থে)। তিনি highest value (সর্বশ্রেষ্ঠ মূল্য) দেন ঈশ্বরে। সংসারের যা value (মূল্য) তাকে বলেন অর্থ। আর ওটি পরমার্থ, অর্থাৎ real value (সত্যিকার মূল্যায়ন) — আমি ঈশ্বরের সন্তান, মায়ের ছেলে। চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে গেছেন, তবুও বিশ্বাস হয় না। মহামায়া পথ রুখে দাঁড়ান। তারও উপায় বলে দিয়েছেন। বলেছেন, সর্বদা প্রার্থনা কর — 'মা, তোমার ভুবনমোহিনী মায়ায় মুগ্ধ করো না।' সব করে দিয়ে গেছেন। এখন বসে বসে আপনারা এই সব উপভোগ করুন। বলেছিলেন, মাকে — অর্থাৎ তাঁরই কথা তাঁকেই, বিশ্বাস করলে আর কিছুই করতে হবে না।

ভক্তরা অনেকেই আসিয়া উপস্থিত হইলেন — বলাই, মনোরঞ্জন, সতীনাথ প্রভৃতি। শ্রীম এবার কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিতেছেন?

শ্রীম (একজন সাধুর প্রতি) — রাতে মঠে কি খাও?

সাধু — একদিন খেয়েছি দু'খানা রুটি ও চারটি ভাত।

শ্রীম (সহাস্যে) — ঠাকুরের সময় খাওয়ার বন্দোবস্ত ছিল, যারা থাকতো ওখানে (দক্ষিণেশ্বরে) তাদের জন্য — রুটি, একটি তরকারী ও একটু গুড়। গুড়টি চাই-ই। সামনে দাঁড়িয়ে দেখতেন।

সাধু — গুড় হজমী।

শ্রীম — ও-ও, তাই আমি তিন চার দিন খাচ্ছি লেবু দিয়ে।

সাধু (স্বগতঃ) — শ্রীম ঠাকুরের বাহ্য আচরণও অনুকরণ করেন শ্রদ্ধায়।

শ্রীম (সতীনাথের প্রতি) — রাত্রে খুব কম খাবে। দিনে বারুদঠাসা খেয়ে নেবে। আর বলতেন, ঠাকুর দেবতা সাধুদের কাছে চলবার সময় 'ধপাস্ ধপাস্' করে শব্দ না হয়।

শ্রীম (সকলের প্রতি) — একজন দক্ষিণেশ্বরে ছিল রাত্রে হরিশের

সঙ্গে। সারা রাত খালি বিষয়ের কথা কইল। হরিশ সকালে ঠাকুরকে বলায় তিনি বিদায় করে দিলেন।

(ভিতর হাস্যে) আর একজন কাশীপুর বাগানে ছিল। (বাইরেও হাসির তুফান তুলে) সে চার পাঁচ জনের খাওয়া একলাই খেয়ে নিত। বামুন ঠাকুর আবার ভাঁড়ার আনতে গেলে, সব শুনে ঠাকুর বললেন, 'দে বিদেয় করে দে, বিদেয় করে দে! বাবা, রাক্ষস যে! দে রাক্ষস বিদেয় করে দে।'

তিনি বলতেন কিনা — 'বেতালা লোক কাছে রাখতে পারি না।' তাই এই রকম। তিনি এসেছিলেন যোগী তৈরী করতে। বেশী যদি খাও, রাত্রে হজম হবে না। পেট গরম হবে। ঈশ্বরচিন্তা করতে পারবে না। সকাল সকাল ঘুম থেকে উঠতে পারবে না।

সুরেনবাবু দিতেন দশ টাকা মাসে মাসে। ঠাকুর বলতেন, তা সুরেনেরই লাভ। আমার কি? ভক্তদের সেবার জন্য দিচ্ছে। একটা সতরঞ্চি রেখে দিলেন আর একটা বালিশ ওখানে।

(সুরেনবাবুকে) বাড়িতে (স্ত্রী) বলতেন — দিনে যেখানে খুশি যাও। রাত্রিতে কোথাও থাকা হবে না (উচ্চহাস্যে)। হাঁ, দিনে যাও যেখানে খুশি, রাত্রিতে থাকা হবে না কোথাও (হাসি বিলম্বিত)।

খাওয়া, যারা মাছ খেত তারা মা কালীর প্রসাদ খেত। আর যারা না খেত, তারা বিষ্ণুঘরের প্রসাদ খেত।

রাম চাটুয্যের খুব প্রশংসা করতেন। বলতেন, রাম বড় ভাল, কি সেবাটাই করে ভক্তদের, কত যত্নে খাওয়ানো। আবার কার সামনে? অধর সেন, এঁদের সামনে। Indirectly recommend (প্রকারান্তরে সুপারিশ) করাই হল এঁদের কাছে। তাঁর এমনি ব্যাপার ছিল। মাছের তেলে মাছ ভাজছেন।

তিনি নিজে খেতেন সুজির পায়েস আর খানকয়েক লুচি।

একজন সাধু — বরাবর?

শ্রীম — আমরা যতদিন দেখেছি, ঐ খেতেন। তাঁর ঐ অবস্থা হলো, (দিব্যোন্মাদ) ফিফ্‌টি-সিক্সে (ছাপান্নতে)। আমরা গেছি এইটি-টুতে (আঠার শ' বিরাশিতে)। আমরা বরাবর ঐ খেতেই দেখেছি।

শ্রীম (স্বগতঃ) — কামারপুকুর, দক্ষিণেশ্বর আবার কাশীপুর! কামারপুকুরেও অনেক লীলা করেছেন। (সকলের প্রতি) — সন্ন্যাস নিয়ে অনেকে কাজ করে। কেন? কর্ম বাকী আছে যে! গীতায় আছে—

আরুরুক্ষোর্মুনের্যোগং কর্ম কারণমুচ্যতে।
যোগারূঢ়স্য তস্যৈব শমঃ কারণমুচ্যতে॥ (গীতা ৬-৩)

যে যোগী হতে চায় তার কর্ম প্রয়োজন। নিষ্কাম কর্ম ব্যতীত চিত্ত শুদ্ধ হয় না। তাই মনও স্থির হয় না। তাই নিষ্কাম কর্ম দরকার। চিত্তের অশুদ্ধি কি? বাসনা। নানা বাসনায় চিত্তকে এদিক ওদিকে টেনে নিয়ে যায়। নিষ্কাম কর্ম করলে চিত্তের বাসনাপ্রসূত এই সব বৃত্তির চাঞ্চল্যের নিরোধ হয়। তাই সূত্র করেছেন পতঞ্জলি, 'যোগঃ চিত্তবৃত্তি নিরোধঃ'।

অধিকাংশ সাধকই আরুরুক্ষ। খুব অল্প লোক যোগারূঢ়। যোগারূঢ়ের অন্য কর্ম নেই। কেবল তাঁকে নিয়ে থাকা।

শ্রীম — (পূর্ব দিকের বাড়ির ছাদে কপোত-কপোতী দেখিয়া ভক্তদের প্রতি) এই দেখ, এরা খালি আহারের চেষ্টায় আছে — কোথায় আহার পাবে। মানুষ কিন্তু তা নয়। তার আরও একটা আছে — ঈশ্বরকে ডাকা।

যে জন্যই তাঁকে ডাক না কেন — তুমি উদার, মহৎ। গীতায় ভগবান এই প্রতিজ্ঞা করেছেন। বলেছেন,

চতুর্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোঽর্জুন।
আর্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ॥ (গীতা ৭-১৬)।

যাঁরা পুণ্যবান 'সুকৃতিনো' তাঁরা তাঁকে ডাকেন। তাঁদের চারটি শ্রেণী — আর্ত, জিজ্ঞাসু, অর্থার্থী আর জ্ঞানী। এরপরই বলছেন, 'উদারাঃ সর্ব এবৈতে জ্ঞানী ত্বাত্মৈব মে মতম্' (গীতা ৭-১৮)। সকলেই সুকৃতিবান, উদার হলেও এঁদের মধ্যে জ্ঞানী শ্রেষ্ঠ। কেন? না, ভগবান বলছেন, জ্ঞানী আমার আত্মা — নিজের স্বরূপ। তাই জ্ঞানীর সেবা, সাধুর সেবা ভগবানেরই সেবা।

জ্ঞানী কেবল আমাকে চায় আর কিছু চায় না — বলছেন ভগবান। আবার অন্য জিনিসের জন্য তাঁকে বলবে না তো কাকে বলবে? তিনি যে সকলের মালিক! কেউ ডাকে, বিপদ দূর কর। কেউ চিত্তের সংশয় মিটিয়ে দিতে ডাকে। কেউ ডাকে অর্থের জন্য, অর্থাৎ ভোগ্য বস্তুর জন্য।

এরা সকাম ভক্ত। কেরমে (ক্রমে) নিষ্কাম হবে। তখন হবে জ্ঞান। এই জ্ঞানীই তাঁর আত্মা, মানে রূপ। জ্ঞানী মানে, যিনি ভগবানকে চান, আর কিছু চান না। ধন মান যশ পুত্র রাজ্য — কিচ্ছু না। কেবল ভগবানকে চান, যেমন নচিকেতা।

শ্রীম (সতীনাথের প্রতি) — আচ্ছা, তোমাদের হোক না।

সতীনাথ — হারমোনিয়াম নেই যে।

শ্রীম — অমনি হোক্ না। নাই বা হল হারমোনিয়াম।

সতীনাথ সুকণ্ঠ, অগত্যা গাহিতেছেন একটি ভৈরব রাগিণী।

গান। অনুপম-মহিম পূর্ণব্রহ্ম কর ধ্যান,
নিরমল পবিত্র ঊষাকালে।
ভানু নব তাঁর সেই প্রেম-মুখছায়া,
দেখ ঐ উদয়গিরি শুভ্র ভালে।
মধু সমীরণ বহিছে এই যে শুভ দিনে,
তাঁর গুনগান করি অমৃত ঢালে,
মিলিয়ে সবে যাই চল ভগবত-নিকেতনে,
প্রেম-উপহার লয়ে হৃদয়-থালে॥

শ্রীম ধ্যানমগ্ন। সম্মুখে বাল ভানু। আবার গান। এবার রাগিণী আসোয়ারী। এইটি শ্রীম-র ফরমাইসী — ঠাকুরের প্রিয় রাগিণী। দুইটিরই রচয়িতা দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

গান। জাগো সকলে অমৃতের অধিকারী।
নয়ন মেলিয়া দেখ করুণানিধান, পাপতাপহারী॥
পূরব অরুণজ্যোতি মহিমা প্রচারে, বিহগ যশ গায় তাহারি।
হৃদয়কবাট খুলি দেখ রে যতনে, প্রেমময় মুরতি জনচিত্তহারী;
ডাক রে নাথে বিমল প্রভাতে, পাইবে হৃদয়ে শান্তির বারি।

ছাদে রৌদ্র আসিয়াছে। শ্রীম সাধু ও ভক্তসঙ্গে ‘নাট মন্দিরে’ গিয়া বসিয়াছেন। অন্তেবাসী শ্রীম-র আদেশে মহাপুরুষের ডায়েরী পড়িয়া শুনাইতেছেন।

২

২১শে অক্টোবর, ১৯৩০ খ্রীস্টাব্দ, মঙ্গলবার।

আজ মহাপুরুষের শরীর একটু ভাল। তাই তিনি বেশ প্রসন্ন। এখন সকাল সাড়ে ছয়টা। উনি খাটে বসিয়া আছেন পশ্চিমাস্য। সম্মুখে ও পাশে সাধুগণে গৃহ পরিপূর্ণ। প্রবেশপথও বন্ধ! তাঁহার সামনে দাঁড়াইয়া আছেন স্বামী মাধবানন্দ, তপানন্দ, রামেশ্বরানন্দ। তক্তাপোশের উত্তর দিকে দাঁড়ান ডাক্তার মহেশ্বরানন্দ। পুণ্যানন্দ, জিতাত্মানন্দ, নিত্যাত্মানন্দ, সেবকগণ অপূর্বানন্দ, শিবস্বরূপানন্দ, বৈরাগ্যানন্দ প্রভৃতিও দাঁড়াইয়া কথা শুনিতেছেন। স্বামী মাধবানন্দ প্রণাম করিয়া উঠিতেই নানা কথা হইতে লাগিল। কথাপ্রসঙ্গে তন্ত্রের কথা উঠিল।

শ্রীমহাপুরুষ (স্বামী মাধবানন্দের প্রতি) — শরৎ মহারাজের বইতে তন্ত্রের কথা আছে বটে ঠাকুরের সম্বন্ধে। কিন্তু শরৎ মহারাজের ঐ ভাব ছিল কি না! এই বই পড়লে মনে হয় যেন তন্ত্রের ভাবই ঠাকুরের বেশি ছিল।

স্বামী মাধবানন্দ — অন্য ভাবও আছে। শাক্ত, বৈষ্ণব, মুসলমান, খ্রীস্টান — সবই আছে।

শ্রীমহাপুরুষ — তা হলেও ঐটেই বেশী।

স্বামী মাধবানন্দ — যেসব materials (তথ্য) তিনি পেয়েছেন সেগুলি সব গুছিয়ে লিখতে বেশী হয়ে গেছে বইতে।

শ্রীমহাপুরুষ — ঠাকুরের শুদ্ধ ভাব — purity, purity, purity (পবিত্রতা, পবিত্রতা, পবিত্রতা) — মাতৃভাব। ঠাকুর-স্বামীজীর ভাব — pure (বিশুদ্ধ) হতে হবে — to the backbone (আগাগোড়া)। বীরভাব-টাব ও-সব আমাদের এখানে নেই। স্বামীজী একে ভারি ঘৃণা করতেন। তাঁদের pure (বিশুদ্ধ) ভাব।

একজন সাধুর কথা উঠিল।

শ্রীমহাপুরুষ — ও কি করছে ওখানে? খান্‌কি মাগী এয়েছিল। আমি খুব বকে দিলাম, ভাগ্‌ হিঁয়াসে। জিভে লিখে দেয় সে, ঠাকুরের মত। ঠাকুরের অনুকরণ করে। ওর কতকগুলি চেলা ওখানে আছে, মাগীঘেঁষা।

স্বামী মাধবানন্দ — উনি তো এক রকম বের হয়ে যাচ্ছেন। ওঁর কাছে যারা আছে তারাও সঙ্গে সঙ্গে যাবে।

শ্রীমহাপুরুষ — তোমরা এই সব লিখে রাখ। আমার তো লিখবার শক্তি নেই। তোমার লিখে জগৎকে জানাও।

ঠাকুরের শুদ্ধ ভাব, মাতৃভাব। ওখানে ঐ সব (বীরভাব) নেই। মহারাজও condemn (তীব্র নিন্দা) করেছিলেন তন্ত্রের ঐ সব...।

মিস ম্যাকলাউডের কথা উঠিল।

শ্রীমহাপুরুষ — ও বড় ভাল লোক — খোলাখুলি। ক্রিশ্চিন ভিতরবুদে ছিল, ম্যাকলাউড বড় খোলা।

ঠাকুর স্বামীজীর কাছে all purity purity purity (পবিত্রতা পবিত্রতা, একেবারে পবিত্রতা)। All love love love! (প্রেম প্রেম, কেবল বিশুদ্ধ প্রেম)। ব্যস্ (হাততালি)!

একঘর ভর্তি লোক। ডাক্তার মহেশ্বরানন্দ তক্তাপোশের উত্তরে দাঁড়াইয়া আছেন, হাতে স্টেথিস্কোপ।

শ্রীমহাপুরুষ — চেয়ে আছিস্, examine (পরীক্ষা) করে করবি কি! শোন্ এই সব কথা শোন্। Mood (ভাব) দেখে বুঝতে পারে না কেমন আছে। শোন্, কথা শোন্ (হাস্য)।

স্বামী মাধবানন্দ — Emotion (উদ্দীপনা) বাড়লে অসুখ বাড়বে। আমাদের ইচ্ছা শরীরটা আরও অনেক দিন থাকে।

শ্রীমহাপুরুষ — হাঁ। হাঁ। এসব কথা নোট কর। লিখে রাখ। পরে কাজ দেবে।

সেবক শিবস্বরূপানন্দ একটি ধোয়া গরদের কাপড় নিয়া ঘরে ঢুকিলেন। শ্রীমহাপুরুষ বলিলেন — দাও, পূজারীকে দাও। আজ পূজা করবে কে?

একজন সাধু — জ্যোতিষ মহারাজ।

শ্রীমহাপুরুষ — ওকে দেওয়া হয়নি?

সেবক অপূর্বানন্দ — হয়েছে।

শ্রীমহাপুরুষ — তবে অন্যদের দাও। যারা পূজা করবে তাদের জন্য এই সব — যারা ধ্যান জপ করবে। বাবুরাম মহারাজ এইভাবে দিতেন।

স্বামী মাধবানন্দ — যারা কাজ করবে তাদের দিতেন।

শ্রীমহাপুরুষ — যারা পূজা পাঠ জপ ধ্যান করবে তাদের তিনি দিতেন।

স্বামী বিরজানন্দ (দক্ষিণের অফিসঘর হইতে) — বাহার হও, বাহার হও। ঘরে খুব ভীড়।

স্বামী রামেশ্বরানন্দ ও তপানন্দ প্রণাম করিলেন। শ্রীমহাপুরুষ জিজ্ঞাসা করিলেন স্বামী তপানন্দকে, কি খেয়েছ?

আজ শ্যামাপূজা রাত্রিতে। ঐ সময় শৈলেশ ও পাটনার বিপিনের সন্ন্যাস হইবে। তাঁহারা উপবাস করিয়া আছেন।

অপরাহ্ন। শ্রীমহাপুরুষকে দর্শন করিতেছেন একজন সাধু দরজার পশ্চিমে দাঁড়াইয়া। শ্রীমহাপুরুষ খাট হইতে উঠিয়া ঘরের বাহির হইতেছেন, অফিসঘরে যাইবেন। সেবক শিবস্বরূপানন্দ ও বৈরাগ্যানন্দ দুই দিকে ধরিয়া রাখিয়াছেন। সম্মুখে শৈলকে দেখিয়া বলিলেন — বাবা, এ ঠাকুরের সন্ন্যাসী — উপোস-টুপোস নেই এখানে।

রাত্রিতে উত্তরের সোনার বাগানের হলঘরে শ্যামাপূজা হইল। তারপর বিরজা হোম হইতেছে। অনেক সাধু আসিয়া দেখিতেছেন। এখানে সন্ন্যাসী ছাড়া কেহ আসিতে পারেন না, এই বিরজা হোমে। শৈলেশ ও বিপিন বিরজা হোম করিতেছেন — আহুতি দিতেছেন, ‘জ্যোতিরহং ভূয়াসং স্বাহা’।

রাত্রি শেষ। নূতন সন্ন্যাসীগণ সকলে শ্রীমহাপুরুষের ঘরে প্রবেশ করিলেন। প্রস্রাব করিয়া আসিয়া ইনি খাটে বসিয়াছেন, সেবক শিবস্বরূপানন্দের সাহায্যে। দিগম্বর। মশারীটি উপরে গুটাইয়া রাখা হইয়াছে, কেবল সামনের দিকটা।

শ্রীম — ঠাকুর ভক্তদের বেশী উপোস করতে দিতেন না। জানেন তো, কলিকালে শরীর মন এমনি দুর্বল। উপোসে আরও দুর্বল হয়ে পড়বে। তখন ঈশ্বরচিন্তা মোটেই হবে না। তাই মধ্যপন্থা।

শ্রীমহাপুরুষের হাতে কাঁচি, শৈলেশের শিখা ছেদন করিতেছেন। শিখাতে কাঁচি লাগিতেছে না। মহাপুরুষ বলিলেন, দূর শালা ...। সেবক টর্চ ধরিলেন। তখন কাটা হইল। বিপিন খাটের সামনে বসিয়াছেন। তখন

তাঁহার শিখা কাটিলেন।

এইবার নূতন সন্ন্যাসী দুইজন নগ্ন হইয়া বস্ত্র ভিক্ষা করিলেন। শ্রীমহাপুরুষ তাঁহাদিগকে গেরুয়া বস্ত্র ও কৌপীন আর উত্তরীয় দিলেন। তাঁহারা উত্তরের দরজার কাছে কাপড় পরিতেছেন। শ্রীমহাপুরুষ রহস্য করিয়া বলিতেছেন — দেখ তো, এঁড়ের চামড়া ঢাকা কি না! ওটা ভক্তির চিহ্ন।

তারপর তিনবার প্রেষমন্ত্র বলিলেন। উঁহারাও তিনবার সঙ্গে সঙ্গে উচ্চারণ করিলেন। এবার মহাবাক্য শুনাইলেন। বলিলেন, অন্যগুলো তোমরা করে দাও। গায়ত্রী ও অন্যান্য মন্ত্র স্বামী ওঁকারানন্দ পাঠ করিতেছেন। শ্রীমহাপুরুষ ও নূতন সন্ন্যাসী দুইজনও আবৃত্তি করিতেছেন সঙ্গে সঙ্গে। এইবার আশীর্বাদ করিলেন — তোমাদের জ্ঞান, ভক্তি, বিদ্যা — সব লাভ হোক্। সব হোক্।

একটু পর শ্রীমহাপুরুষ বলিলেন, কি কৈলাসানন্দ (হাস্য)? শৈলেশের এই নাম হইয়াছে। শৈলেশ মাথা নিচু করিয়া আশীর্বাদ গ্রহণ করিলেন।

বিপিনকে ডাকিলেন — কি মৈথিল্যানন্দ? বিপিন পাটনায় থাকেন, তাই সীতার নামে তাঁহার নাম রাখিলেন।

শ্রীমহাপুরুষ বলিলেন, আজ থেকে এই আশ্রয়ে এলে তোমরা।

স্বামী ওঁকারানন্দও সঙ্গে সঙ্গে এই কথার আবৃত্তি করিলেন, হাঁ মহারাজ, আপনাদের আশ্রয়ে।

শ্রীমহাপুরুষ (প্রতিবাদ করিয়া) — আমাদের আশ্রয়ে কি? প্রথমতঃ ঠাকুর মা স্বামীজীর আশ্রয়ে। তারপর এই সঙ্ঘের আশ্রয়ে — সাধুমণ্ডলীর আশ্রয়ে।

আজ ২৪শে অক্টোবর, ১৯৩০ খ্রীস্টাব্দ, শুক্রবার। বেলুড় মঠ। সকাল সাতটা। শ্রীমহাপুরুষের ঘর। ইনি তক্তাপোশে বসিয়া সামান্য আহার করিলেন হরলিক্‌স্।

তোতলা নরেন মহারাজ প্রণাম করিতেই শ্রীমহাপুরুষ বালকের ন্যায় আনন্দে বলিয়া উঠিলেন — কি রাঘবেশ্বরানন্দ, তোমার নাম রাঘবেশ্বরানন্দ (হাস্য)?

স্বামী রাঘবেশ্বরানন্দ — ঘুম হয়েছিল?

শ্রীমহাপুরুষ (প্রসন্ন রহস্যে) — হাঁ, ঘুমই, ঐটি আসল। ঐটি না হলে সব গোলমাল।

বিদ্যাপীঠের একজন সাধু আসিয়া প্রণাম করিলেন।

শ্রীমহাপুরুষ — ভাল আছ?

সাধু — আজ্ঞে হাঁ।

শ্রীমহাপুরুষ — মাস্টার মশায়ের খবর পাও?

সাধু — আজ্ঞে হাঁ। দুই দিন ভাল ছিলেন। কাল আবার সন্ধ্যার সময় ঐ ভাব (বেদনা) হয়েছিল। উনি নিজেই বলেছিলেন, কথা বললেই হয়, কিন্তু কথা বন্ধ হয় না।

শ্রীমহাপুরুষ — ঐ তো মুস্কিল আমাদের! ভক্ত লোক, কথা না বলেই বা কি করেন! ঠাকুরই জানেন। তিনি যুগাবতার ঈশ্বর, তিনিই জানেন। জিভ কাটিয়া মাস্টার মহাশয়ের বেদনার জন্য দুঃখ প্রকাশ করিলেন।

শ্রীমহাপুরুষ — আমাদের তো এই। লোক আসে, আমরা কি বলি — তাঁর দু'টো কথা বলি। যাক্, এই মাটির ঢেলা যাক্, তুচ্ছ শরীর। এ তো যাবেই, তবে তাঁর কথা বলেই যাক্।

তাঁকে (মাস্টার মশায়কে) আর কি বলবো। তিনি তো সব বোঝেন নিজেই। (সম্মুখের দেওয়ালে বিলম্বিত ঠাকুরের ছবির দিকে তাকাইয়া) যা হয় হবে — তাঁর ইচ্ছা।

সাধু — আজ্ঞে, তিনিও বলেন, কথা বললেই বাড়ে। আবার না বলেই বা কি করি।

ভাস্কর জানা দরজার চৌকাঠের কাছে দাঁড়াইয়া আছে।

শ্রীমহাপুরুষ — কি জানা, রোগা হয়ে যাচ্ছ কেন? এঁরা (কর্মকর্তারা) কিছু ঠিক করলেন? কোথাও যাবে তুমি, না এখানেই থাকবে?

ভাস্কর হাসিতেছে দরজায় দাঁড়াইয়া।

শ্রীমহাপুরুষ (দরজার কাছে দণ্ডায়মান বিদ্যাপীঠের একজন সাধুর প্রতি) — কি বলছে?

সাধু — আজ্ঞে, বিশ্বানন্দ স্বামী লিখলেই চলে যাবে।

শ্রীমহাপুরুষ — ও, বম্বে থেকে?

সাধু — আজ্ঞে হাঁ।

৩

২৫শে অক্টোবর, ১৯৩০ খ্রীস্টাব্দ, শনিবার।

সকাল ছয়টা। শ্রীমহাপুরুষ নিজের ঘরে নূতন খাটে বসিয়া আছেন। মঠের ভাণ্ডারী বিকাশ মহারাজ আসিয়া প্রণাম করিয়া চলিয়া যাইতেছেন। দরজার বাহির হইয়াছেন, শ্রীমহাপুরুষ ঠিক কিশোর বালকের ন্যায় তাঁহার সহিত ফচ্‌কেমি করিতেছেন। বলিলেন — ঐ পালাচ্ছে, কুত্তায় ধরবে। আয় শুনে যা (খলখল হাস্য)। বিকাশ ঘরে গেলেন।

শ্রীমহাপুরুষ — হাঁ, কি কি হবে বাবার (ঠাকুরের) সেবায়?

ভাণ্ডারী বলিলেন কয়েক প্রকার নাম। তাহার মধ্যে মাছ হইবে শনিবার বলিয়া।

শ্রীমহাপুরুষ (আনন্দে) — হাঁ ভাল করে কর। সাধুদের প্রসাদ খাওয়া। টাকা লাগে আমি দেব। ব্যস্‌।

বিদ্যাপীঠের একজন সাধু প্রণাম করিলেন। উঠিতেই মহাপুরুষ কথা কহিতে লাগিলেন।

শ্রীমহাপুরুষ (সাধুর প্রতি) — মাস্টার মশায় কেমন?

সাধু — বড়ই দুর্বল। কথা কইলেই বেড়ে যায় বেদনা (নিউরালজিয়া)।

শ্রীমহাপুরুষ — এই দেখ, আমারও তাই। কথা কইলেই বাড়ে। উনি তাঁর (ঠাকুরের) কথা ছাড়া অন্য কথা ক'ন না। আমি তাঁর কথা কম কই — দু'টো একটা। বাজে কথাই বেশী কই।

একজন সাধুর কথা উঠিল।

শ্রীমহাপুরুষ উত্তেজিত স্বরে বলিতেছেন — ও শালার কথা উঠলেই বাবা, আমার শরীর কেমন হয়ে যায়। বুড়ো বয়সে শালা করছে কি? ঠাকুর জানেন কি হবে।

সেবক কৈলাসানন্দ (কথার স্রোত বন্ধ করিবার জন্য) — মহারাজ, এই নূতন খাটটা ভারি সুন্দর হয়েছে।

শ্রীমহাপুরুষ (বালকের ন্যায় পূর্ব প্রসঙ্গ ভুলিয়া) — হাঁ, আমি ভারি

খুশী হয়েছি। কি দেবে ওকে (মঠের শিল্পশালার কর্মীকে)? তার জ্ঞান ভক্তি বিবেক বৈরাগ্য হোক।

শ্রীম — আহা, মহাপুরুষ কিনা! জানেন অন্য কিছুই থাকবে না। তাই আশীর্বাদ করলেন, জ্ঞান ভক্তি বিবেক বৈরাগ্য লাভ হোক — এগুলি অনন্ত কাল থাকবে।

সাতটার সময় খাটে বসিয়া অবিনাশের ছোট গীতা খুলিয়া সপ্তম অধ্যায় পাঠ করিতেছেন। উচ্চারণ অস্পষ্ট ও বিজড়িত।

বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে।
বাসুদেবঃ সর্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভঃ।। (গীতা ৭-১৯)।

জিহ্বা দিয়া শব্দ করিয়া দুর্লভত্ব প্রকাশ করিয়া মহাপুরুষ বলিলেন, ঈশ্বরদর্শন অতি দুর্লভ জিনিস! ঠাকুর এই দুর্লভ জিনিস আমাদের হাতে ধরে অনায়াসে দিয়েছেন। তিনিই স্বয়ং ঈশ্বর।

শ্রীম — (জিভে তিনবার শব্দ করিয়া) হাঁ, অহেতুক কৃপাসিন্ধু ঠাকুর। সত্যিই, আমাদের হাতে ধরে ঈশ্বরকে দেখিয়ে দিয়েছেন। বিনা চেষ্টায় লাভ হয়েছে ঈশ্বরকে ভক্তদের।

২৬শে অক্টোবর, ১৯৩০ খ্রীস্টাব্দ, রবিবার।

সকাল সওয়া ছয়টা। শ্রীমহাপুরুষের ঘরের দরজা বন্ধ। সেবক মতি গৃহকর্ম করিতেছেন বাহিরে। ঘরের ভিতর শব্দ শুনা যাইতেছে স্বামী বিজয়ানন্দের। নীলকণ্ঠ মহারাজও আসিয়া বাহিরে দাঁড়াইয়া আছেন। বিদ্যাপীঠের একটি সাধু পূর্ব হইতেই দাড়ানো। দরজা বন্ধ দেখিয়া তাঁহারা গৃহে প্রবেশ করেন নাই। সেবক মতি বলিলেন, যান না ভিতরে। স্বামী মাধবানন্দের সম্বন্ধে কথা হইতেছিল।

সাধুরা প্রণাম করিলেন ভূমিষ্ঠ হইয়া। কথাবার্তা হইতেছে।

একজন সাধু — আজ বিদ্যাপীঠে যাব। কাল খুলবে।

শ্রীমহাপুরুষ — তুমি চা খাও?

সাধু বুঝিলেন স্বামী বিজয়ানন্দকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, তাই জবাব দেন নাই।

স্বামী বিজয়ানন্দ বলিলেন — না।

শ্রীমহাপুরুষ — হাঁ, তুমি তো দেওঘরের লোক। বেশ যাবে, এসো।

কালকে মাস্টার মহাশয়ের কাছে গিছলে?

সাধু — আজ্ঞে হাঁ।

শ্রীমহাপুরুষ — কেমন আছেন?

সাধু — ভাল না, বড়ই দুর্বল। কথা কইতে কইতে হঠাৎ বন্ধ হয়ে যায়।

শ্রীমহাপুরুষ — এই, আমারও তাই। দুর্বল, তা তো হবেই। ঠাকুর জানেন। এসব ঠাকুরের লোক। তাঁর যা ইচ্ছা তাই হবে। কি বল?

স্বামী বিজয়ানন্দ — আজ্ঞে হাঁ।

শ্রীমহাপুরুষ (সাধুর প্রতি) — আচ্ছা এসো। সেবক মতিকে মুখে হাত দিয়া বলিলেন, দাও।

সেবক মতি বাহিরের মিট্‌সেফ হইতে একটি হলুদ রং-এর কৌটাভর্তি সন্দেশ দিলেন। পূর্বেই মতিকে সাধু বলিয়াছিলেন, কর্তার একটু প্রসাদ যেন দেওয়া হয় কালকে। তাই মতি পূর্ব হইতেই প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন। সাধু শ্রীমহাপুরুষের পায়ে হাত দিয়া প্রণাম করিয়া বিদায় লইলেন।

সকাল সাড়ে আটটা। মঠের সাধুদের খাবার ঘরের চালায় বসিয়া বিদ্যাপীঠের একজন সাধু ও স্বামী প্রজ্ঞানন্দ এক থালায় ভাতে ভাত আহার করিতেছেন। সেবক বৈরাগ্যানন্দও খাইতেছেন। ইনিই বিদ্যাপীঠের সাধুর জন্য রান্না করিয়াছেন।

সাধু যাত্রা করিবেন। মনে বাসনা, আর একবার যাইবার আগে শ্রীমহাপুরুষ মহারাজকে দর্শন ও প্রণাম করিবেন। এই সঙ্কল্প লইয়া দ্বিতলে গিয়া দেখিলেন, দরজা বন্ধ। বুঝিলেন, তিনি খাটে শুইয়া আছেন। পাশে সেবক হিরণ্ময় দাঁড়াইয়া কথা কহিতেছেন। এক-পা দুই-পা করিয়া ঘরে প্রবেশ করিলেন সাধু। দেখিলেন, সেবক শৈলেশও দাঁড়াইয়া কথা কহিতেছেন। শৈলেশ ডাকিলেন, আসুন।

শ্রীমহাপুরুষ — কে?

সাধু — আমি জগবন্ধু, দেওঘর রওনা হচ্ছি।

শ্রীমহাপুরুষ — আচ্ছা বাবা, এসো। কখন যাবে, কয়টায় গাড়ী?

সাধু — নয়টা পঁচিশে।

শ্রীমহাপুরুষ — খাবে কোথায়?

সাধু — এখানে থেকে ভাতে ভাত খেয়ে যাচ্ছি।

শ্রীমহাপুরুষ (আহ্লাদে) — বেশ বেশ যাও, এসো।

সাধু — আশীর্বাদ করবেন যেন জ্ঞান ভক্তি লাভ হয়।

শ্রীমহাপুরুষ — তা তো রয়েছেই। হাঁ, খুব জ্ঞান ভক্তি হোক, খুব হোক। জ্ঞান ভক্তি বিশ্বাস সব হোক, ব্যস্।

শ্রীমহাপুরুষ — বাবা বৈদ্যনাথকে আমার প্রণাম জানাবে। আর প্রার্থনা করবে শরীরটা যাতে ভালয় ভালয় যায়, কষ্ট না হয়। আর ঐ —

সাধু — কি, মাস্টার মশায়ের জন্য?

শ্রীমহাপুরুষ — হাঁ। যাতে ঐ শরীরটাও ভালয় ভালয় যায়। তিনি শুনলে হয়। তিনি স্বতন্ত্র, কারো কথায় চলেন না। নিজের ইচ্ছায় চলেন — স্বতন্ত্র। তবুও আমাদের তো একটা কর্তব্য আছে! তাই প্রার্থনা করবে আমার জন্য, আর মাস্টার মশায়ের জন্য।

সাধু — আজ্ঞে প্রার্থনা করবো।*

শ্রীমহাপুরুষ — হাঁ করবে। পায়ে হাত দিয়ে আর কাজ নেই, বাবা।

সাধু চলিয়া যাইতেছেন। শ্রীমহাপুরুষ বলিতেছেন, খুব জ্ঞান ভক্তি হোক বাবা, খুব হোক। আশ্রমের সব ছেলেদের আমার আশীর্বাদ দিও।

সাধু আবার দোরগোড়া হইতে খাটের কাছে গেলেন।

শ্রীমহাপুরুষ — দিও আশীর্বাদ।

সাধু — আজ্ঞে হাঁ, দেব।

সাধু দরজার কাছে গিয়াছেন।

শ্রীমহাপুরুষ — একটু প্রসাদ নিয়ে যাও।

সাধু আবার খাটের কাছে আসিলেন।

শ্রীমহাপুরুষ — ওরা তো বাবা বৈদ্যনাথের প্রসাদ পাঠিয়ে দেয়। তুমিও বাবা, রামকৃষ্ণের প্রসাদ নিয়ে যাও (বালকের ন্যায় খিলখিল করিয়া হাস্য)। হাঁ, নিয়ে যাও।

সাধু — আজ্ঞে হাঁ, নিয়ে যাচ্ছি।

শ্রীমহাপুরুষ — হাঁ, যা হোক বাতাসা-টাতাসা — যা হোক কিছু।

---

* পরবর্তী চার বৎসর, প্রত্যহ সন্ধ্যায় বৈদ্যনাথ মন্দিরে গিয়া সাধু উক্তরূপ প্রার্থনা করিয়াছিলেন।

এইখান থেকে নিয়ে যাও, আমাদের এইখান থেকে।

শৈলেশ বাহিরে গেলেন। মিট্‌সেফ হইতে প্রসাদ বাহির করিলেন, সন্দেশ।

শ্রীমহাপুরুষ — তা হলে এসো। ট্রেনটায় বেশ দিনে দিনে যাওয়া যায়। দুর্গা, দুর্গা, দুর্গা।

শ্রীমহাপুরুষ খাটের মধ্যস্থলে শয়ান চিৎ হইয়া, যেন ছোট ছেলে। শরীর কংকালসার। গত কাল বিকালে ও রাত্রিতে শরীর খুব খারাপ গিয়াছে।

সাধু ঘরের মেঝেতে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিলেন খাটের পাদস্পর্শ করিয়া। স্বামী বৈরাগ্যানন্দ সঙ্গে গিয়া হেম পালের গলিতে বাসে উঠাইয়া দিলেন। হাওড়া স্টেশনে যখন পৌঁছিলেন — মাত্র দুই মিনিট বাকী।

ডায়েরী পাঠ শেষ হইল। শ্রীম ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া কথা বলিতেছেন।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — এতে লোকের খুব কল্যাণ হবে। আমরা শুনে লাভবান হলাম। অপরেরও তা হবে। এ যেন চিত্রাবলী! তুলিতেই কি কেবল চিত্র হয়? কলমেও হয়। কালিদাসের কলম-চিত্র অতুলনীয়।

ইনি আমাদের এ অমৃত পরিবেশন করলেন। আমরা আর কি দিতে পারি! এই নিন, বলিয়া খাবারের ঠোঙ্গা সাধুর হাতে তুলিয়া দিলেন। সকলেই প্রসাদ পাইতেছেন। প্রচুর নিমকি আসিয়াছে।

ভক্তগণ আনন্দে প্রসাদ পাইতেছেন। সতীনাথ বলিলেন, নুন কম। তৎক্ষণাৎ শ্রীম উত্তর করিলেন — ক্রাইস্ট বলেছিলেন, 'Ye are the salt of the earth' (জগতের নুন যে তোমরা) অর্থাৎ ভক্তগণ। সংসারভোগে যখন অরুচি আসে তখন সাধু ভক্তের সঙ্গ করলে চিত্তের রুচি ফিরে আসে। তখন ‘নুন’ অর্থাৎ ভগবানের প্রেমরস সিঞ্চিত হয় মনে। নূতন মন হয়। নূতন জগৎ। নূতন উদ্যম। এটি ভাগবৎ জীবন।

অন্তেবাসী এবার ভূমিষ্ঠ হইয়া শ্রীমকে প্রণাম করিয়া বিদায় লইলেন। তিনি মঠে যাইবেন। বরানগর পর্যন্ত সঙ্গে গেলেন স্বামী রাঘবানন্দ।

বেলুড় মঠ।
১৬ই মে, ১৯৩১ খ্রীস্টাব্দ, শনিবার।

অষ্টাদশ অধ্যায়

এই শেষ কথামৃত-পাঠ

১

মর্টন স্কুল। চারতলার ছাদ। এখন অপরাহ্ন পৌনে সাতটা। শ্রীম কিছুকাল নিজের শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়াছেন। বাহিরে ছাদে ভক্তরা কেহ কেহ বসিয়া আছেন শ্রীম-র অপেক্ষায়। পূর্ণেন্দু, ঘোষ মশায় প্রভৃতি আসিয়াছেন।

গ্রীষ্মকাল। আজ ৮ই জুন ১৯৩১ খ্রীস্টাব্দ। ২৩শে জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৫ সাল, সোমবার। অন্তেবাসী আসিয়া ভক্তদিগের সঙ্গে মিষ্টালাপ করিতেছেন। তিনি বিগত দুই দিন গৌরীপুরে ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন স্টুডেন্টস্ হোমে। আজ নূতন চশমা লইয়া ডাক্তারের নিকট হইতে আসিয়াছেন।

ইতিমধ্যে শ্রীম ছাদে আসিয়া উপস্থিত। সাধু ও ভক্তগণকে শ্রীম যুক্ত করে 'নমস্কার নমস্কার' — এই শব্দ উচ্চারণ করিয়া অভিবাদন করিলেন। শ্রীম-র ইহাই রীতি, স্বীয় গুরু শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের মত। সকল মানুষে, সকল জীবে শ্রীভগবানের অধিবাস বলিয়া সকলকে নমস্কার করেন। শ্রীমদ্‌ভাগবত একেই উত্তম ভক্তের লক্ষণ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। শ্রীম আসন পরিগ্রহ করিলে সাধু ও ভক্তগণ শ্রীমকে প্রতিনমস্কার করিয়া বেঞ্চির উপর বসিলেন। শ্রীম-র বামহাতে জোড়া বেঞ্চিতে বসিয়াছেন অন্তেবাসী। ভক্তরা সামনে ও ডান দিকে বেঞ্চিতে বসা।

শ্রীম-র পরনে সাদাপেড়ে ধুতি। গায়ে একখানা দুই ভাঁজ করা বস্ত্র। সেই বস্ত্রের উপর বক্ষস্থলে একখানা ওয়ার-ফ্লানেলের ধূসর রঙ্গের গরম পাঞ্জাবী। শরীর ভাল নয়। দারুণ গরমে আরও খারাপ। চেহারা রুক্ষ। প্রশান্ত গম্ভীর বৃহৎ সুমুখ-ঠেলা চক্ষু দুইটিতে দৈহিক যন্ত্রণার প্রতিচ্ছবি। অন্তেবাসীর কষ্ট হইতেছে এই চেহারা দেখিয়া। এবার কথাবার্তা আরম্ভ

হইয়াছে।

অন্তেবাসী — আপনার শরীর কি বড্ড খারাপ আজ?

শ্রীম — দুপুরে বড়ই গরম। ঘরে থাকা যায় না। তাতে আবার ঘরে পশ্চিমের রোদের চাপ। তাই এখানে (সিঁড়ির ঘরে) ছিলাম।

শ্রীম (অন্তর্মুখী মনে অন্তর হাস্যে) — এমন helpless (অসহায়) অবস্থা। তা দেখে মানুষ কি করে বলে 'আমি কর্তা'?

নিজের ইচ্ছায় কি মেঘ বা বৃষ্টি করতে পারছে? তা'তে তো হচ্ছে না। তবে 'কর্তা' কোথায়?

স্ত্রী-পুরুষ একত্র হলো। এখন তারা ইচ্ছা করলেই কি ছেলে জন্মাতে পারছে? যখন একত্র হয় তখন যদি মনে করে ছেলে হোক — ও মা, হয়ে পড়লো মেয়ে!

(বিজ্ঞ হাস্যে) মানুষ বলছে, 'আমি কর্তা'। অমনি ঈশ্বর তাকে শুনিয়ে বলছেন — 'না, আমি কর্তা' — 'পিতাহমস্য জগতো মাতা ধাতা পিতামহঃ (গীতা ৯-১৭)।' কেবল তাই নন্, নিজের পরিচয় আরও দিচ্ছেন।

গতির্ভর্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ।
প্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থানং নিধানং বীজমব্যয়ম্।। (গীতা ৯-১৮)।

নিজের সর্বব্যাপিত্ব প্রকট করে আবার বলছেন, আমি কেবল কারণই নই — সর্বকার্যও আমি —

অহং ক্রতুরহং যজ্ঞঃ স্বধাহমহমৌষধম্।
মন্ত্রোঽহমহমেবাজ্যমহমগ্নিরহং হুতম্।। (গীতা ৯-১৬)

'মন্ত্রোঽহমহমেবাজ্যম্' বলিয়াই শ্রীম জিজ্ঞাসা করিলেন, এরপর কি? অন্তেবাসী উত্তর করিলেন — 'অহমগ্নিরহম্ হুতম্'। শ্রীমও সঙ্গে সঙ্গে এই চরণাংশ আবৃত্তি করিলেন।

শ্রীম — আরও শোন কি বলছেন ঈশ্বর — আমাকে ছেড়ে ব্রহ্মাণ্ডে কিছুই নেই।

মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়।
ময়ি সর্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণা ইব।। (গীতা ৭-৭)।

শ্রীম — যেমন সকল মণির আশ্রয়স্থল সূত্র, তেমনি ব্রহ্মাণ্ডের সকল বস্তুর আশ্রয়স্থল আমি। আমাকে ছেড়ে কারও অস্তিত্ব নেই। আমিই কারণ, আমিই কার্য। কার্যের সম্বন্ধে আরও বলছেন —

ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্মহবির্ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মাণাহুতম্।
ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্মকর্মসমাধিনা।। (গীতা ৪-২৪)

সকল কর্মও তিনি, সকল বস্তুও তিনি। সকলের কারণও তিনি ‘বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ’ (গীতা ১০-৪২)। আমিই অখণ্ড সচ্চিদানন্দ, বাক্য মনের অতীত। আবার আমিই জগৎরূপে প্রতিভাত। (সকলের প্রতি) এই সব ঈশ্বরের মহাবাক্য — তাঁর দাবী। আর তুমি নিজেও দেখছো, এই নিদারুণ গরমে জ্বলে যাচ্ছ। ইচ্ছা করছ মেঘ হোক, বৃষ্টি হোক, কিন্তু তা করতে পারছ না। আবার পুত্রৈষণায় উন্মাদ। কিন্তু পুত্রোৎপাদন হচ্ছে না তোমার ইচ্ছায়। এই মুরোদ নিয়ে তুমি কি করে বল ‘আমি কর্তা’?

দুই কর্তা নেই — কর্তা এক। তোমার কর্তাগিরি যখন টিঁকছে না বিচারে এবং তোমার কাছে তোমার শক্তিহীনতায়, তখন উচিত তোমার আত্মসমর্পণ করা। থাক তা হলে — যেমন বড়ঘরের দাসী থাকে, তেমনি। ঠাকুর তো এই বিরুদ্ধ দুই ভাবের সমন্বয় করেছেন এই প্রক্রিয়ায়। তোমার কর্তৃত্ববুদ্ধি যখন যাচ্ছে না, অথচ কর্তার মত হুকুম করে এই গ্রীষ্মে সুখদায়ক বৃষ্টি আনতে পারছ না, তখন ঠাকুরের ব্যবস্থা গ্রহণ কর, তাতে তোমার অহংকারের স্থান হবে, তোমার কর্তাগিরির মান রক্ষা হবে। ঈশ্বরের কর্তৃত্বের সঙ্গে তোমার নগণ্য কর্তৃত্বের মিলন করে দাও। দাসের কর্তৃত্ব, ভক্তের কর্তৃত্ব, পুত্রের কর্তৃত্ব নিয়ে থাক। পরমানন্দে থাকবে। যিনি এই দুষ্ট অহংকারটা সৃষ্টি করেছেন, তিনিই একে বশে আনবার পথও বলে দিয়েছেন। ‘আমি কর্তা তুমি দাস’ — তাঁর এই ব্যবস্থা মাথায় তুলে নাও যাবৎ দেহেতে ‘আমি’ বুদ্ধি থাকে। গরল অমৃত হয় এতে।

শ্রীম (সকলের প্রতি) — আমরা একদিন ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম — আচ্ছা, দয়া — তাও তো বন্ধনের কারণ? ঠাকুর উত্তর করলেন, দয়ারূপেই যে তিনি লোকের ভেতর রয়েছেন। তিনিই দয়া।

একজন ভক্ত (স্বগতঃ) — তাহলে কি দয়া আদি গুণসমূহ চাপা উচিত নয়, তাদের স্বাভাবিক বিকাশ করা উচিত?

শ্রীম (একটু ভাবনার পর) — সবই যদি তুমি, আমি কোথায় দাঁড়াই তা হলে? Where then do I go in, man (তা হলে বাপু আমি যাই কোথায়)? (হাস্য) Punch-এ (পাঞ্চ পত্রিকায়) বেশ একটা news (সংবাদ) বের হয়েছিল। Punch (পাঞ্চ) মানে ভোটরঙ্গ।

ও দেশে (ওয়েস্টে) একজন গর্ভনর ছিল । তার বাপ বুড়ো হয়েছে। ছেলের বাড়িতে গেছে। ছেলে বাড়ির সব ঘর দেখাচ্ছে — এই ঘর আমার ড্রইং রুম। এটা ডাইনিং রুম। এটা ড্রেসিং রুম। এটা পড়বার ঘর। আর এটা বেড-রুম। অর্থাৎ, সব ঘরই occupied (অধিকৃত)। ছেলের ইচ্ছা, বুড়ো ওখানে না থাকে। থাকলেই সেবা করতে হবে। তখন বাপ বলল, Where then do I go in, man (তা হলে বাপু আমি যাই কোথায়)? (হাস্য)। সবই যদি তুমি, আমার স্থান কোথায় তা হলে?

শ্রীম (সকলের প্রতি) — ও, সন্ধ্যে যে হয়ে গেছে। যান্, আপনারা ঘরে গিয়ে ঠাকুরদর্শন করুন। তারপর তুলসীতলায় বসে ধ্যান করুন।

সাধু ও ভক্তগণ শ্রীম-র সঙ্গে গৃহে প্রবেশ করিলেন। দেয়ালে বিলম্বিত শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ, চৈতন্য-সংকীর্তন, শ্রীঈশা প্রভৃতি নরদেবতাদের ছবি। সপার্ষদ ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবেরও ছবি আছে। আর আছে শিব-পার্বতী, সপ্তর্ষি, পাণিহাটির শ্রীচৈতন্যমহোৎসব প্রভৃতির ছবি। শ্রীম এই সকল ছবির প্রত্যেকটিকে হ্যারিকেনের আলো দেখাইতেছেন আর নাম করিয়া একে একে সকলকে প্রণাম করিতেছেন। ভক্তগণও শ্রীম-র অনুকরণ করিতেছেন। সপ্তর্ষির ছবি দেখাইয়া বলিলেন, এই দর্শন করুন সপ্তর্ষি। এঁরা আদি ঋষি। এঁরা হিমালয়ে তপস্যা করেছিলেন। দেয়ালে একটি খোলও টাঙ্গান রহিয়াছে। শ্রীম নিত্য সন্ধ্যার সময় উহাতে দুই হাতে চাঁটি দিয়া বাদ্য করেন। আজও তাহা করিলেন।

এইবার শ্রীম ছাদে পুষ্পকাননে তুলসীমঞ্চের সম্মুখে ধ্যানমগ্ন। সাধু ও ভক্তগণ শ্রীম-র পশ্চাতে বসিয়া ধ্যান করিতেছেন।

২

আটটার সময় শ্রীম উঠিয়া আসিয়া দক্ষিণ দিকে নিজের আসনে চেয়ারে বসিলেন উত্তরাস্য। সাধু ও ভক্তগণ নিজ নিজ আসনে বসিলেন। সাধুরা বসিয়াছেন শ্রীম-র বাম হাতে জোড়া বেঞ্চিতে সতরঞ্চির উপর।

স্বামী রাঘবানন্দও আসিয়া আসন গ্রহণ করিলেন। মস্তক মুণ্ডন করিয়াছেন। শ্রীম তাঁহাকে চিনিতে পারেন নাই অন্ধকারে। জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি কি ওয়েলিংটন (অদ্বৈতাশ্রম) থেকে এসেছেন? অন্তেবাসী বলিলেন, আমায় জিজ্ঞাসা করছেন? শ্রীম উত্তর করিলেন, না। ইতিমধ্যে স্বামী রাঘবানন্দকে চিনিতে পারিয়াছেন, বলিলেন, ও। স্বামী রাঘবানন্দ বলিলেন, চুল ফেলে দিয়েছি। বড় গরম। শ্রীম হাসিয়া বলিলেন, তাই আমি চিনতে পারি নি।

একথা সেকথার পর সংস্কারের কথা উঠিল।

স্বামী রাঘবানন্দ — সংস্কার দেখা যায় না মহামায়ার প্রভাবে। কিন্তু অনুমান করা যায় কার্যে — একথা বেদান্ত বলেন। পতঞ্জলী বলেন, দেখা যায়।

শ্রীম (কিঞ্চিৎ অপ্রীতির সহিত) — ঠাকুর যে বলতেন সংস্কার সত্য। তা হলে মানতে হবে। এতে বিচার কি?

স্বামী রাঘবানন্দ — পতঞ্জলীর ভাব — সংস্কার বিভূতি দিয়ে বৃদ্ধি করা যায়। তখন দেখা যায়, যেমন সম্পাতি। তার দৃষ্টিতে সীতাকে অশোক বনে দেখতে পেল। অপরে দেখতে পায় নি। তেমনি যোগবিভূতি দিয়ে ঐশ্বর্যের বৃদ্ধি হয়। একেই বলা হয়, দেখা যায়। এইরূপে পূর্বজন্ম স্মরণ করা যায়।

শ্রীম — ও, আপনি জাতিস্মরত্বের কথা বলছেন? তা অর্জুনের ছিল না, অত বড় লোক হয়েও। ভগবান বলছেন —

> বহূনি মে ব্যতীতানি জন্মামি তব চার্জুন।
> তান্যহং বেদ সর্বাণি ন ত্বং বেত্থ পরন্তপ॥ (গীতা ৪-৫)

অর্জুন, তোমার ও আমার বহু জন্ম অতীত হয়েছে। আমি সে সবের কথা জানি — 'তান্যহং বেদ সর্বাণি'। কিন্তু তুমি জান না, 'ন ত্বং বেত্থ পরন্তপ'। এ সম্বন্ধে আমরা নিশ্চিন্ত।

(প্রতিবাদের স্বরে) — That question therefore does not arise at all (তাই যদি হয় তবে জাতিস্মরত্বের কথা মোটেই আসছে না)।

আবার ঠাকুরকে দেখ। তিনি ওদিক দিয়েই যান নি। বলছেন, 'আমি অষ্টসিদ্ধি চাই না মা, আমি শতসিদ্ধি চাই না মা' — কেবল তোমার পাদপদ্মে শুদ্ধাভক্তি চাই — শুদ্ধা, অমলা, অচলা ভক্তি। এ তাঁর মুখের কথা। শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলেছিলেন, এসব বিভূতির ঐশ্বর্য দিয়ে সংসারে বড় হতে পারবে, কিন্তু আমায় পাবে না। অর্জুন এই কথা শুনে আর তা নিতে চান নি।

এ দিয়ে তাঁকে লাভ না হলে, এর দাম কি? যদি ধরে নেওয়াও যায় সংস্কার দেখা যায়, বিভূতি দিয়ে বাড়িয়ে সম্পাতির দৃষ্টিশক্তির মত, তাহলেও এতে লাভ কি? এতে কি ঈশ্বর দর্শন হবে?

স্বামী রাঘবানন্দ — কেন, ঠাকুরের তো বিভূতি ছিল, প্রকাশ করেন নি।

শ্রীম (নিবিড় অপ্রীতির সহিত প্রতিবাদের সুরে) — হাঁ, থাকবে না কেন? তিনি যে ঈশ্বর! (আকাশ ও তারকা দেখাইয়া) এগুলি কি তা হলে? ঈশ্বরের ঐশ্বর্য থাকবে না? তবে একটা বিশিষ্ট message (বার্তা) দেবার জন্য মানুষদেহ ধারণ করে এসেছেন। সেইটের জন্য বললেন — 'মা, তোমার পাদপদ্মে আমায় শুদ্ধাভক্তি দাও।' তিনি (ঠাকুর) কি মানুষ? তাঁকে মানুষবুদ্ধি করলে কিছুই হবে না। তিনি ঈশ্বর।

তিনি কেন এই প্রার্থনা করলেন? তা না হলে সব লোক এইসব নিয়ে মত্ত হয়ে যাবে আর তাঁকে ভুলে যাবে। তখন আরও বেশী গোলমালে পড়বে। তাই ওসব কথা — বিভূতির কথা বললেনই না। তার জন্যই — that question does not arise at all (ঐ প্রশ্ন, বিভূতির কথা একেবারেই আসছে না)।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — মানুষ কি নিয়ে রয়েছে — toys, play things (খেলনা, ক্রীড়নক) সব নিয়ে আছে। ঠাকুর এসে বললেন, 'আমার ঈশ্বর-বই কিছুই ভালো লাগে না।' তাই স্বামীজী, as an interpreter of him (ঠাকুরের উপযুক্ত ভাষ্যকাররূপে) ও দেশে

(পাশ্চাত্ত্যে) বলতেন, তোমরা একে life বলছো — একটু থিয়েটার, একটু ড্যান্স! একে কি life (জীবন) বলে? যা দিয়ে eternal peace, everlasting joy (শাশ্বত শান্তি, শাশ্বত সুখ) লাভ হয় তাই life (জীবন)। স্বামীজীর কথা ওরা বুঝতে পারে নি। কি করে বুঝবে — immersed in materialism (বিষয়ানন্দে যে ডুবে আছে)!

Christianity without Christ! (ক্রাইস্টহীন খ্রীস্টধর্ম) যা ক্রাইস্ট বারণ করলেন তাই তারা করলে। তিনি বললেন, what does it profiteth thee if ye gain the whole world and loseth thy soul (আত্মাকে বিসর্জন করে জগতের অধীশ্বর হয়েই বা কি লাভ)? 'Whole world' মানে ঐশ্বর্য, ভোগের বস্তু। 'Soul' মানে ঈশ্বর। তারা সেইটে নিলে 'the whole world' (বিষয়ানন্দ, কামিনী কাঞ্চন)। ক্রাইস্ট life-টা (জীবন) ঠেলে ফেলে দিয়েছেন। আজকাল আবার higher criticism (উচ্চস্তরের) সমালোচনা হয়েছে — অর্থাৎ ক্রাইস্ট ছিলেন কি না — এ সম্বন্ধে বিচার। (সহাস্যে) আচ্ছা, lower criticism (নিম্নস্তরীয় সমালোচনা) আবার কোনটা?

শ্রীম (জনৈক সাধুর প্রতি) — ঠাকুর বলতেন, স্বামীজী এ কথাটা ওদেশের লোককে সর্বদা শোনাতেন — পাশের ঘরে সোনা রয়েছে, solid ruggets of gold (নিরেট সোনার ঢেলাগুলো)। চোর একথা জানতে পেরেছে, কিন্তু ঢুকতে পারছে না ঘরে। তার যেমন ব্যাকুলতা, তেমনি ব্যাকুলতা থাকলে তাঁকে পাওয়া যায়। কিছুই ভাল লাগছে না। সব আছে, তবুও ছট্‌ফট্ করছে।

তেমন ব্যাকুলতা হয় না কেন? ও গুলোতে (ভোগের জিনিসে) মন রয়েছে। Toys (খেলনা) নিয়ে যেমন ছেলেরা থাকে, তেমনি দেহেতে মন রয়েছে। অন্য দিকে চেষ্টা থাকা উচিত নয়। কিসে তাঁকে লাভ হয় — এই এক চিন্তা, এই চেষ্টা।

আগে তাঁকে লাভ, তারপর সিদ্ধাই ফিদ্ধাই যা চাইতে হয়, চাও। তাঁকে লাভ, তাও বলে গেছেন, তিনি প্রত্যক্ষ হন চোখের সামনে, আবার কথা ক'ন।

অতএব যতক্ষণ না তাঁকে লাভ হচ্ছে ততক্ষণ অন্য question-ই

(প্রশ্নই) নাই। That question does not arise at all (বিভূতি সিদ্ধাইয়ের কথা মোটেই আসছে না)।

জাগ্রত, স্বপ্ন, সুষুপ্তি — এই তিন অবস্থার পারে তিনি। ঠাকুর এই message (দিব্যসংবাদ) দিতে এসেছিলেন মানুষশরীর ধারণ করে।

একজন ভক্ত — ঠাকুর তো আবার আসবেন।

শ্রীম (এই প্রশ্নের উত্তর না দিয়া) — দেখ না, কি প্রেম! এক বছর কি যন্ত্রণা! মাঝে মাঝে বলছেন, মৃত্যুযন্ত্রণা। তার ভিতরই ভক্ত তৈরী হচ্ছে।

স্বামী রাঘবানন্দ — আচ্ছা, রোগ হলে অনেকে যন্ত্রণা চেপে রাখে। অনেকে আবার 'গেলুম ম'লুম' করে। এ করা উচিত কি?

শ্রীম — চেপে রাখবে কতক্ষণ? যন্ত্রণা বের হয়ে পড়বে।

স্বামী রাঘবানন্দ — হরি মহারাজ (স্বামী তুরীয়ানন্দ) বলতেন আমাদের, ও আমার একটা স্বভাব — চেপে থাকা। রোগের সময় আমরা একটু কিছু করলে বলতেন, একটু সহ্য কর — অত কেন?

শ্রীম — আমার personal question (নিজের কথা) বলি। বিছার কামড়ে আমি তো চেঁচামেচি করে সাতবাড়ির লোক জড় করলাম। ঠাকুরকে স্মরণ করতেই — ওমা, কোথায় সব চলে গেল!

ওতে আর কি হয় — 'গুণাগুণেষু বর্তন্তে'।

স্বামী রাঘবানন্দ — কেন আঙ্গুলহাড়ার সময় কত সইলেন।

শ্রীম — তাঁর সওয়ার মতো! নিজমুখে এক একবার বলতেন — যেন যমযন্ত্রণা।

স্বামী রাঘবানন্দ — চেষ্টা করা উচিত সইতে।

শ্রীম — চেষ্টাও যে তিনি হয়ে রয়েছেন।

অন্তেবাসী (আস্তে আস্তে স্বামী রাঘবানন্দের প্রতি) — বললেন যে আগে, চেষ্টা করে পতি-পত্নী কি পুত্রসন্তান উৎপাদন করতে পারেন? কিংবা দারুণ গ্রীষ্মে কি মানুষ বৃষ্টি আনতে পারে?

শ্রীম (অন্তেবাসীর প্রতি) — কি বলছো?

অন্তেবাসী — পতি-পত্নীর চেষ্টায়ই কেবল পুত্র হয় না। গরমে ইচ্ছা করলেই বৃষ্টি হয় না।

শ্রীম — হাঁ, মানুষের চেষ্টায় কেবল হয় না। এই সঙ্গে তাঁর ইচ্ছা মিলিত হলে হয়।

৩

শ্রীম পুনর্বার বলিলেন পতিপত্নীর কথা, গ্রীষ্মের বৃষ্টির কথা। বলিলেন, সবই যে তিনি। আমি কোথায়? আবার Punch-এর গল্পটা বলিলেন — where then do I go in man' (তাহলে বাপু, আমি যাই কোথা)?

শ্রীম হাস্য করিতেছেন। আবার কথা।

শ্রীম (একজন সাধুর প্রতি) — ঠাকুরকে দেখেছি রোগযন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করতেন। আবার এরই ভেতর সমাধি মুহুর্মুহু। তখন আর এক মানুষ! মুখকমল যেন প্রস্ফুটিত কমল! ডাক্তার মহেন্দ্র সরকার দেখে তো অবাক। ক্যানসারের রোগীর একি আনন্দময় দৈবী অবস্থা! ঠাকুর এক একবার রহস্য করে বলতেন ডাক্তারকে — কিগো, এ বুঝি তোমার সায়েন্সে নেই!

বলতেন, ‘মা আমাকে বালকের অবস্থায় রেখেছেন। আমি যে মায়ের ছেলে — তাই এ ছটফট। বালকের মা চাই।’

একদিন রাখাল ঠাকুরের ভাঙ্গা হাতটা লুকিয়ে রেখেছে। হাতে ‘বার’ বাঁধা। হাতটা একটা চাদর দিয়ে ঢেকে রেখেছে। কে একজন এয়েছে। অমনি ঠাকুর হাত খুলে তাকে বলছেন — এই দেখ, হাত ভেঙ্গেছে, বড় যন্ত্রণা (সকলের হাস্য)।

ঠাকুরের ঐ অবস্থা আদর্শ — বালকস্বভাব। বৃহদারণ্যকে আছে, সকল জেনে বালক হয়ে যায় — ‘বাল্যে তিষ্ঠাসীৎ’। ভগবানদর্শনের পর হয় ঐ অবস্থা।

আমাদের বালকের স্বভাব নয়। তাই অন্য ব্যবস্থা। আমাদের শাস্ত্র মেনে চলা — তিতিক্ষাদি অভ্যাস করা উচিত!

জনৈক শ্রোতা বলিলেন, ঠাকুর যে বলেছেন শাস্ত্র চিনিতে-বালিতে মেশান। কোন্‌টা ত্যাজ্য কোনটা গ্রাহ্য? কি করে বুঝবে লোক?

শ্রীম — ঠাকুর তারও উপায় বলেছেন। বলেছেন, গুরুমুখে শাস্ত্র শুনতে হয়। গুরু মানে — সিদ্ধ গুরু, সৎ গুরু, মন্ত্রদ্রষ্টা। তাঁর কাছে পড়লে ঠিক ঠিক অর্থ বোঝা যায়। তা নইলে চিত্তভ্রমের কারণ হয়

শাস্ত্রপাঠ।

অবতার যখন আসেন তখন হয় শাস্ত্রের ঠিক ঠিক interpretation (ব্যাখ্যা)। ইদানীং ঠাকুর এসে শাস্ত্র ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর জীবনটা, তাঁর প্রতিটি কাজ শাস্ত্রের ভাষ্য।

শ্রীম (একজন ভক্তের প্রতি) — 'কথামৃত'খানা (চার পার্ট একত্রে বাঁধান) আনুন তো।

শ্রীম নিজে কথামৃত পড়িতেছেন — তৃতীয় ভাগ, চতুর্দশ খণ্ড। ঠাকুর বলরাম মন্দিরে। ভক্তের মজলিশ বসিয়াছে। ঠাকুর নিজের সাধনের অলৌকিক অবস্থা সব বর্ণনা করিতেছেন। ভক্তগণ অবাক হইয়া ঐ বর্ণনা শুনিতেছেন।

সাধু ভক্তগণ অনেকদিন পর শ্রীম-র নিজ মুখে কথামৃত পাঠ শুনিতেছেন পরমানন্দে। নিজেই পাঠক, নিজেই ব্যাখ্যাতা। প্রথম অধ্যায় পাঠ হইলে কথা কহিতেছেন।

শ্রীম (সকলের প্রতি) — ঠাকুর বলছেন, ধ্যানের সময় একজন শূল হাতে করে বসে থাকতো। ভয় দেখাচ্ছে। মন ভগবানের পাদপদ্মে না রাখলে শূলের বাড়ি মারবে। বলছেন, 'সে সাধনের সময় মন কখনও লীলায় নামিয়ে আনতেন মা। তখন সীতারাম-রূপদর্শন হতো। কখনও রাধাকৃষ্ণ, কখনও গৌরাঙ্গের ভাবে থাকতাম।' গৌরাঙ্গে দুই ভাবের মিলন — অন্তরে কৃষ্ণ, বাইরে রাধা।

আবার কখনও লীলা থেকে নিত্যে মা নিয়ে যেতেন মনকে। লীলা ভাল লাগতো না — 'লীলাতে বিচ্ছেদ আছে'। তখন ঘরের সব দেবীদের ছবি সব খুলে নামিয়ে রাখতেন। অখণ্ড সচ্চিদানন্দ, যিনি বাক্য মনের অতীত, তাঁতে মন ডুবে যেতো। যেমন নুনের পুতুল সমুদ্রে মিশে গেল। আবার কখনও সেই অখণ্ড সচ্চিদানন্দকে চিন্তা করতেন — সেই পুরুষকে। তখন নিজেকে ঠাকুর মনে করতেন, সেই পুরুষের দাসী।

নিরাকার নির্গুণ, নিরাকার সগুণ, আর সাকার সগুণ — এই তিন অবস্থায় যেন বাচ খেলতেন — যেমন নৌকোর বাচ খেলে লোক।

কখনও ষট্‌পদ্মে আত্মার রমণ দেখাতেন মা। কুণ্ডলিনীযোগে সিদ্ধি, মানুষ কত চেষ্টায় লাভ করে। ঠাকুরের পক্ষে যেন জলবৎ তরল। পরমাত্মা

ঠাকুরের রূপ ধারণ করে ঠাকুরের ভিতর প্রবেশ করলেন। আর মূলাধার মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ আত্মা ও সহস্রার সবগুলি পদ্মের সঙ্গে রমণ করলেন। নিম্নমুখ পদ্মগুলি ঊর্ধ্বমুখ হয়ে গেল। সহস্রারে গেলে কি হয় তা মুখে বলা যায় না।

হাজার লেক্‌চারে যা না হয় দু'টি দৃষ্টান্ত দিয়ে বুঝিয়ে দেওয়ায়, ধ্যান কি — এ বোঝা আর কঠিন রইল না।

যেমন ব্যাধ পাখীর দিকে তাক করেছে। পাশ দিয়ে বরযাত্রী বাজনা বাজিয়ে চলে যাচ্ছে। তার খবর নেই। কিংবা যখন একজন মাছ ধরে বড়শিতে। তার সবটা মন ফাতনাতে। পথিক কতো ডাকছে, ওদিকে হুঁশ নেই। গভীর ধ্যানে বাহ্যজ্ঞান থাকে না।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — দেখুন, সিদ্ধাই তিনি চাইতেন না। ব্যারাম ভালো করা, মোকদ্দমা জেতানো, জলের উপর দিয়ে হেঁটে চলা — এসব করতে পারতেন না। (সহাস্যে) হৃদয়ের কথায় একদিন চাইলেন কালীঘরে কিছু সিদ্ধাই। মা দেখিয়ে দিলেন, তা বেশ্যার গু — হীন, অতি অপবিত্র জিনিস!

সিদ্ধাই দেখিয়ে অনেকে গুরুগিরি করে। তাকে বললেন বেশ্যাগিরি। কে পারে একথা বলতে ঠাকুর ছাড়া, যিনি মা-বই কিছু জানেন না?

বেলতলায় ধ্যানে পাপ-পুরুষকে দেখলেন। টাকাকড়ি, মান, ইন্দ্রিয়সুখ, নানারকম শক্তি দিতে চাইলো পাপপুরুষ। ঠাকুরের ভয় হলো। জগদম্বাকে ডাকতে লাগলেন। তিনি এলে তাঁকে দিয়ে ঐ পাপপুরুষকে কেটে ফেলা হল। মায়ের তখনকার ভুবনমোহিনী রূপ। চাউনিতে জগৎ কাঁপছে! ক্রাইস্টকে চল্লিশ দিন এই পাপপুরুষ প্রলোভন দেখিয়েছিল।

বলছেন, এসব অতি গুহ্য কথা। আর বলতে দিচ্ছেন না মা। মুখ চেপে ধরে রেখেছেন। যতটা লোক নিতে পারবে ততটা বলাচ্ছেন মা ঠাকুরের মুখ দিয়ে।

একেই বলে revelation (দৈবলব্ধ জ্ঞান)। এরই নাম বেদ। বেদ এইভাবে প্রকাশ হয়েছিল।

কিছুক্ষণ নীরব, পুনরায় কথা।

শ্রীম — মা আর ঠাকুর এখন আলাদা। বস্তুতঃ ঠাকুরই মা, মা-ই

ঠাকুর। লীলায় এসেছেন, তাই দু'টি। একটি ছেলে, একটি মা। ঠাকুরের দেহ মনটা দিয়ে জগদম্বা বায়স্কোপের মত আধ্যাত্মিক অলৌকিক সব ছবি দেখাচ্ছেন।

নিজে credit (বাহাদুরী) নেবেন না কিছুতেই। মানুষের ঠিক বিপরীত। সব credit (বাহাদুরী) মা-র। তাই ভক্তদের শিক্ষার জন্য বললেন, 'হ্যাঁ গা, আমার কি অপরাধ হল এসব গুহ্য কথা বলায়?' আবার নিজেই উত্তর করলেন — 'না, অপরাধ কেন হবে? আমি লোকের বিশ্বাসের জন্য বলেছি।' কিসে বিশ্বাস? শাস্ত্রে, অবতারে বিশ্বাস।

যাদের বলছেন, তাদের চোখের সামনে যেন মাকে নিয়ে এসেছেন। আহা, কি জিনিসে তৈরী ঠাকুরের শরীর মন! যার ভুবনমোহন রূপে জগৎ কম্পিত, কোটি বিজলী চমক যার, সেই জিনিস ঠাকুর নিজের শরীর মনে ধারণ করেছেন!

জনৈক (স্বগতঃ) — ঠাকুরের কথা যে শ্রীম-র প্রাণজল, যেমন মাছের প্রাণ। এই দারুণ গরমে লণ্ঠনের আলোতে চশমা ছাড়া কি করে পড়ছেন? মনে হয়, শ্রীম-র যেন দেহবুদ্ধি নেই এ সময়। আর এক কথা — অত বড় বই, কত কথা, কি করে সব মনে রাখলেন? লোকে যে বেদব্যাস বলে শ্রীমকে, ঠিকই বলে।

স্বামী রাঘবানন্দ — ঠাকুর বলছেন, 'কিন্তু তোমাদের সাকার রূপে (রামসীতা, রাধাকৃষ্ণ প্রভৃতিতে) বিচ্ছেদ আছে।' তা'হলে এসব রূপ কি অনিত্য?

শ্রীম — না। অনন্তকাণ্ড কিনা। নিত্য কৃষ্ণ, নিত্য ভক্ত আছে আবার।

শ্রীম আরও দুই অধ্যায় পাঠ করিলেন। হ্যারিকেনের আলো চোখে লাগে তাই একজন এক টুকরা কাগজ দিয়া উহা ঢাকিয়া দিলেন।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — ছেচল্লিশ সাতচল্লিশ বছরের কথা এসব! কিন্তু মনে কি impression (রেখাপাত) করে দিয়েছেন, যেন কাল হয়ে গেল, মনে হচ্ছে।

একজন ভক্ত — ঠাকুরের ধ্যানের সময় বললেন, 'যেন বারবাড়িতে কপাট পড়লো'। এর মানে কি?

শ্রীম — রূপ রস গন্ধ শব্দ স্পর্শ — এ গুলিতে মন নেই। মন

নিবিষ্ট ভগবানের পাদপদ্মে। বিষয় থেকে মন উঠে গেলে আর কি!

অমৃত — গুরুগিরিকে বেশ্যাগিরি বললেন। কুলগুরুরাও কি তাই?

শ্রীম — না। যারা কুলগুরু, হয়তো তাদের কেউ আদেশ পেয়েছে। ঐ আদেশেরই কাজ চলছে। ঠাকুর বলেছেন আদেশ পেলে লোকশিক্ষা হয়। যারা কেবল লোকমান্য, অর্থলাভের জন্য শিষ্য করে তাদের নিন্দা করা হয়েছে এতে। যে মন দিয়ে ঈশ্বরলাভের চেষ্টা করবে, সে মন বিষয়ভোগে লাগানো উচিত নয়, এই কথাই বলেছেন।

একজন ভক্ত — গিরিশবাবু ঠাকুরকে বললেন, আপনারও তো বিয়ে আছে — এর মানে কি?

শ্রীম (সহাস্যে) — সংসারের নিন্দা করলেন কিনা! ‘হাজার শ্যেয়ানা হও গায়ে কাদা লাগবে’, বললেন। ‘পাঁকাল মাছের মতো’ থাকতে বললেন। ‘কলঙ্ক-সায়রে সাঁতার দেবে, তবুও কলঙ্ক গায়ে লাগবে না’। গিরিশবাবুর অভিপ্রায় — আপনার গায়েও কি কলঙ্ক লাগে, আপনি তো বিয়ে করেছেন? হাঁ, এ একটা interesting point (মজার বিষয়) বটে!

তাই ঠাকুর উত্তর দিলেন — ‘বিয়ে করলেও আমার সংসার করা হয়নি। কোন দেহসম্পর্ক নেই।’ বিয়ে কেবল সংস্কারের জন্য। দেহেতে মন নেই। মন মায়ের পাদপদ্মে সর্বদা। তা’হলে সংসার কি করে হবে! নজীর বললেন — এক মতে, দেবীভাগবতের মতে আছে শুকদেবেরও বিয়ে হয়েছিল সংস্কারের জন্য।

স্বামী রাঘবানন্দ — শুকদেবের বিয়ে হয়েছিল বললে লাটু মহারাজ (স্বামী অদ্ভুতানন্দ) মারতে যেতেন (হাস্য)।

অন্তেবাসী — মহাভাব আর নির্বিকল্প সমাধি কি এক?

শ্রীম — ঠাকুর বলেছেন, শুদ্ধাভক্তি আর শুদ্ধজ্ঞান এক। অর্থাৎ, উভয়ের গন্তব্যস্থল ঈশ্বর। সম্ভোগও একই বস্তুর — ব্রহ্মানন্দের। শুদ্ধাভক্তির শেষ অবস্থা ভাবসমাধি। এ জীবকোটির হয়। এ ভাব আরও ঘনীভূত হয়ে সুগভীর হয়ে, হয় প্রেম। প্রেমের পরাকাষ্ঠা মহাভাব। মহাভাব ঈশ্বরকোটির হয়। শ্রীরাধার ও চৈতন্যদেবের হয়েছিল। ঠাকুরের হয়েছিল। দেশকাল বোধ থাকে না। জ্ঞানপথের শেষ অবস্থা নির্বিকল্প সমাধি, নিরাকার নির্গুণে মন বিলীন। এটা জীবকোটির হয় জ্ঞানপথে। এরই

পরিপক্ক, আরো গম্ভীর অবস্থা জড়সমাধি। ঠাকুর ছয়মাস এতে ডুবে ছিলেন। ঠাকুরের দুই অবস্থাই হয়েছিল, মহাভাব ও জড় নির্বিকল্প অবস্থা। চৈতন্যদেবেরও দুই অবস্থা ছিল। কিন্তু একটানা মহাভাবে ছিলেন শেষের দ্বাদশ বৎসর।

অন্তেবাসী — 'খুঁটি মিললো' — এর মানে কি?

শ্রীম — যারা আসবে হিসাব ছিল, সকলে তারা এসেছে। পূর্ণর আসায় সেই সংখ্যা পরিপূর্ণ হল।

(সহাস্যে, ভক্তদের প্রতি) — 'তুই গোলাপকে ধর' — কেন ঠাকুর এ গল্পটি বললেন? বোঝাতে, সকলেই 'মেগের দাস'। ঠাকুর বলতেন, কামিনী-কাঞ্চনই সংসার। কামিনীই সংসার। কাঞ্চন কামিনীর সেবার জন্য দরকার।

আজ বড়বাবু বললে, কর্ম খালি নেই। গোলাপ সুপারিশ করায় কর্ম খালি হল। উমেদারকে সে কর্মে ভর্তি করলো। আর বড় সাহেবকে বললো, এ ব্যক্তি উপযুক্ত। একে নিয়েছি। এর দ্বারা অফিসের অনেক লাভ হবে। স্ত্রীর কথায়, 'গোলাপের' কথায়, মিথ্যা সত্য হয়, মন্দ ভাল হয়। এটি তাঁর অবিদ্যামায়ার খেলা।

তাই ঠাকুর বললেন ভক্তদের, এটা জেনে সংসার কর। তখন হবে বিদ্যার সংসার। কামিনী-কাঞ্চন ঈশ্বরকে ভুলিয়ে দেয়, এটা জেনে সংসার করা। একেই বলে বিবেক। বললেন, এ যেন জল ছাঁকা দিয়ে জল ছেঁকে নেওয়া।

সকল মানুষের প্রিয় কামিনী-কাঞ্চন। ঠাকুর বলছেন, 'মাইরি বলছি, ঈশ্বর-বই আর কিছুই জানি না। আমার ঈশ্বর-বই আর কিছুই ভাল লাগে না।' কে পারে একথা বলতে — ঈশ্বর ছাড়া, অবতার ছাড়া? এ কথাটি নিয়ে যদি কেউ সারা জীবন পড়ে থাকে সে সিদ্ধ হয়ে যাবে।

কেন ঠাকুরকে আদর্শ করা? এই জন্য। তিনি জানতেন একথা ষোল আনা। তাইতো বলতেন, 'আমাকে ধ্যান করলেই হবে।' একেবারে সম্পূর্ণ শুদ্ধ পবিত্র। আবার, কারণও বলতেন — 'মা, আমি তো দেখছি আমার দেহ মন বুদ্ধি সবই তুমি — জগদম্বাময়, ঈশ্বরময়'। একেবারে 'শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্' ঠাকুর।

একজন ভক্ত — কেবল সত্যকে ধরে থাকলে ঈশ্বরলাভ হবে, ধ্যান জপ করতে হবে না?

শ্রীম — ঠাকুর বলতেন তো, সত্য কথা কলির তপস্যা। সত্যে থাকলে ভগবানকে পাওয়া যায়। কলিতে লোকের মন দুর্বল, শরীরও দুর্বল। কৃচ্ছ্রসাধন হয় না। তাই সহজ সাধন বললেন, সত্যকে ধরে থাকা। দৃষ্টান্তস্বরূপ বললেন, কেশব সেন সত্যকে ধরে ছিলেন। বাপের ঋণ সব শোধ করেছিলেন — কোনও লেখাপড়া ছিল না, তবুও।

একজন ভক্ত — সীতাপতি মহারাজের আহারের দেরী হয়ে যাচ্ছে।

শ্রীম — আচ্ছা, আজ থাক্ পাঠ এখানেই। অন্যদিন হতে পারবে।

রাত্রি সাড়ে নয়টা। শ্রীম পৌনে এক ঘন্টা পাঠ করিলেন।

শ্রীম (নিদ্রালু অমৃতের প্রতি চাহিয়া) — কি পড়া হলো বলুন (সকলের হাস্য)।

(সহাস্যে অন্তেবাসীর প্রতি) — আজ ঠাকুরবাড়ি থেকে এলে আপনাকে সতীনাথবাবুর চুল দেখাব।

স্বামী রাঘবানন্দ — সতীনাথ বড় রাগ করেছে আমার ওপর, চুলের কথা বলায়।

শ্রীম — তা'হলে ওকথা বলা হবে না। ওটা vulnerable point (মর্মঘাতী)।

অন্তেবাসী আজ ঠাকুরবাড়িতে রাত্রিবাস করিবেন। মনোরঞ্জনের সঙ্গে ঠাকুরের পদস্পৃষ্ঠ তীর্থস্থানগুলি দর্শন করিলেন। তাঁহারা দেখিলেন নববিধান ব্রাহ্মসমাজ, রাজা দিগম্বর মিত্রের প্রাসাদ, ঠাকুরের বড় দাদার সংস্কৃত পাঠশালার স্থান ও রাজেন মিত্রের বাড়ী। ঠাকুরবাড়িতে আসিলেন রাত্রি দশটায়।

ঠাকুরবাড়ি, গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেন, কলিকাতা।
৮ই জুন, ১৯৩১ খ্রীস্টাব্দ, ২৩শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৫ সাল। সোমবার।

ঊনবিংশ অধ্যায়

কমল কানন

১

আজ ৯ই জুন ১৯৩১ খ্রীস্টাব্দ, মঙ্গলবার। অন্তেবাসী এখানে রাত্রিবাস করিয়াছেন। সকাল ছয়টার সময় শ্রীম ঠাকুরবাড়িতে আসিয়াছেন মর্টন স্কুল হইতে। অন্তেবাসীকে বলিলেন, ডায়েরী শোনাও। তিনি ডায়েরী পড়িতেছেন।

আজ ১৪ই মে ১৯৩১ খ্রীস্টাব্দ, বৃহস্পতিবার।

বেলুড় মঠ। বৈশাখ সংক্রান্তি। সকাল সাতটা। দেওঘর বিদ্যাপীঠ হইতে একজন সাধু এইমাত্র আসিয়াছেন। সঙ্গে ঢাকার ভক্ত গায়ক নীরদবাবু। সাধু ঠাকুরঘরে গিয়া প্রথমে প্রণাম করিলেন। তারপর ওখান হইতে জানালা দিয়া শ্রীমহাপুরুষকে দর্শন করিলেন।

খানিক পরে আবার শ্রীমহাপুরুষ দর্শন, ঘরের উত্তর দরজা দিয়া। সামনের দরজায় নীল পরদা। শ্রীমহাপুরুষ খাটের উপর উপবিষ্ট, উত্তরাস্য। সেবক মতি খাটের উত্তর দিকে দাঁড়াইয়া আছেন, আর শৈলেশ দক্ষিণ-পশ্চিমে। পশুপতি সম্মুখে।

সাধু মতির হাতে বাবা বৈদ্যনাথের পেঁড়া প্রসাদ দিলেন। গত বৎসর গ্রীষ্মের সময় শ্রীমহাপুরুষ বৈদ্যনাথের প্রসাদ এই সাধুর নিকট চাহিয়াছিলেন। বলিয়াছিলেন, কই, বাবা বৈদ্যনাথের প্রসাদ? সাধু তাই প্রসাদ আনিয়াছেন এবার শ্রীমহাপুরুষ মহারাজের জন্য সওয়া সের পেঁড়া, আর শ্রীমাস্টার মহাশয়ের জন্য সওয়া সের। (পরবর্তী তিন বৎসরও প্রসাদ আনিয়াছিলেন)।

সেবক মতির হাতে প্রসাদ দিয়া হাত ধুইয়া শ্রীমহাপুরুষকে ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিলেন সাধু।

শ্রীমহাপুরুষের গলদেশে লাল তাগায় একটি মাদুলী ঝুলিতেছে।

প্রসন্ন বদন, দুশ্চিন্তার নামগন্ধও নাই। যেন আনন্দময় বালক, মাতৃক্রোড়ে সমাসীন। আধ আধ বাণী অস্পষ্ট।

সাধু প্রণাম করিতেই জিজ্ঞাসা করিলেন, ভাল আছিস্? ছুটি হয়েছে কতদিন?

সাধু — দেড় মাস।

শ্রীমহাপুরুষ (তর্জনী দিয়া চক্রাবর্তন করিয়া) — ঘুরে ঘুরে দেখ সব। মাস্টার মশায়ের ওখানে যাবে।

আরও কিছু বলিলেন, কিন্তু বুঝা গেল না। দুই একদিন হয় হাঁফানি বাড়িয়াছে।

প্রসাদ সমস্তটাই মতি সম্মুখে ধরিলেন। শ্রীমহাপুরুষ অঙ্গুলিতে সামান্য গ্রহণ করিয়া বলিতে লাগিলেন আনন্দে — বাবা বৈদ্যনাথের প্রসাদ! বড় শক্ত প্রসাদ! এতে রোগ সেরে যায়।

এই বলিয়া খাইতে লাগিলেন অতি ভক্তিভরে। মনে মনে যেন কি ভাবিতেছেন।

আবার বলিলেন, আজ তো সকাল থেকে কিছু খাই নি, দাও আর একটু। মতি আর একটু দিলেন।

শ্রীমহাপুরুষ খাইতেছেন আর বলিতেছেন — এ বড় শক্ত প্রসাদ!

শৈলেশ — সকালের সন্দেশ খাবেন?

শ্রীমহাপুরুষ — না। প্রসাদ দাও বাবা, বৈদ্যনাথের প্রসাদ। এর বড় গভীর মাহাত্ম্য। এতে শরীর মন ভাল হয়ে যায়। এ বড় জবর প্রসাদ!

মুখে হাত দিয়া সাধুকে জিজ্ঞাসা করিলেন ইঙ্গিতে, কিছু খেয়েছ কি? সাধুকে দেখাইয়া সেবকদের প্রতি ইঙ্গিতে মুখে হাত দিয়া প্রসাদ দিতে বলিলেন। সাধু বাহিরে গেলেন প্রসাদ লইবার জন্য।

এখন সকাল সাড়ে আটটা।

স্বামী অশোকানন্দ প্রচারের জন্য আমেরিকা যাইতেছেন, তাই আজ মঠে ভাণ্ডারা। সন্ধ্যায় মঠপ্রাঙ্গণে তাঁহার বিদায়সভা। তখন শ্রীমহাপুরুষ নিজের ঘর হইতে জানালা দিয়া উঁকি দিয়া একবার সভা দর্শন করিলেন।

বেলুড় মঠ। শ্রীমহাপুরুষের ঘর। সকাল পৌনে ছয়টা। সাধুগণ অনেকে প্রণাম করিতে আসিয়াছেন। শ্রীমহাপুরুষ খাটের উপর উপবিষ্ট। শরীর রুগ্ন,

খুব দুর্বল। হাঁফানির কষ্ট। রাত্রিতে প্রায় নিদ্রা নাই। গরম, তাই খালি গা।

তিনি গঙ্গা দর্শন করিবেন। তাই একখানা চেয়ার ঘরের দক্ষিণের টেবিলের কাছে রাখা আছে। পূর্ব দিকের 'মহারাজের' ঘরের দরজা দুইটি খুলিয়া দিয়াছে। গঙ্গা দর্শন হইতেছে।

আজ ১৫ই মে ১৯৩১ খ্রীস্টাব্দ। ১লা জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৮ সাল, শুক্রবার।

ঘরে এখন আছেন যোগেশ মহারাজ, শাশ্বতানন্দ, গিরিশ, বুদ্ধ, জগবন্ধু আর কয়েকজন সাধু। জগবন্ধু প্রণাম করিতেই বালকের ন্যায় খেলাচ্ছলে হাসিয়া বলিলেন, নীলকণ্ঠ!

জগবন্ধু — না, জগবন্ধু।

শ্রীমহাপুরুষ (পুনরায় হাসিয়া) — তা আমি জানি।

রোগে পূর্বের গম্ভীর ভাব আর নাই, কৌতুকপ্রিয় বালক যেন সময় সময়। সাধুদের এখন আর ভয় ভয় ভাব নাই। প্রেমময় মহাপুরুষ! সিংহতুল্য ভাব অন্তর্হিত। মাতৃস্নেহের উৎস মহাপুরুষ! বালক পরমহংস মহাপুরুষ!

যোগেশ আজ আমেরিকা যাইবেন। প্রণাম করিতেছেন। শ্রীমহাপুরুষ (হাতের ইশারায় গিরিশের প্রতি) — কে?

গিরিশ — যোগেশ মহারাজ, অশোকানন্দ মহারাজ।

শ্রীমহাপুরুষ (ইঙ্গিতে আবার জিজ্ঞাসা) — কে?

গিরিশ (পুনরায়) — অশোকানন্দ মহারাজ।

শ্রীমহাপুরুষ (এবার বুঝিতে পারিয়া সহাস্যে) — অশোকানন্দ স্বামী! ও-ও, চিনতে পারি নি। আজ যাবে? যাও, দুর্গা বলে লাফ দাও — জয় দুর্গা বলে। জয় রাম বলে লাফ দাও। স্বামীজী জয় রাম বলে লাফ দিয়েছিলেন। স্বামীজীকে ঠাকুর বলেছিলেন, তোকে এর (সাগরের) পারে যেতে হবে — পণ্ডিচেরীতে। কি জানি ঠাকুর কি না। (স্মরণ করিয়া) না ঠাকুরই বলেছিলেন। তারপর তিনি মার কাছে চিঠি লিখলেন। জান তো চিঠির কথা? মা লিখলেন, 'নরেন আমার জগজ্জয়ী হবে।' তোমরা তো স্বামীজীর কাজেই যাচ্ছ? ঠাকুর স্বামীজীকে বলেছিলেন, 'আমার নাম প্রচার করতে হবে'। তোমরা তো তাঁর নাম প্রচার করতে যাচ্ছ। Success sure, success sure (সাফল্য নিশ্চয়, সাফল্য নিশ্চয়)।

যা, চলে যা — দুর্গা বলে চলে যা। সর্বত্রই তাঁর ভক্ত। সিঙ্গাপুর প্রভৃতি সব জায়গা দেখবে, আদর পাবে। তাঁর ভক্ত সব জায়গায় আছে।

রোগে ও ঈশ্বরীয় ভাবে মহাপুরুষ মহারাজের সব এলোমেলো হইয়া গিয়াছে। 'তুই, তুমি' ভেদ উঠিয়া গিয়াছে। লৌকিক ব্যবহারের ঊর্ধ্বের অবস্থা — আনন্দময় নিশ্চিন্ত ভাব। যেন মায়ের কোলে শিশু!

পূর্ব দিকের দরজা দিয়া রৌদ্র আসিতেছে।

মতি — বন্ধ করে দেব গঙ্গার দিকের বারান্দার দরজা?

শ্রীমহাপুরুষ — হাঁ (এই বলিয়া যুক্তকর কপালে ঠেকাইয়া প্রণাম করিতেছেন) জয় মা পতিতপাবনী — মা ভবতারিণী।

কি মধুর স্বর, কি আবেগ, কি প্রেম, কি হৃদয়মাখা কথা! এই দেবদৃশ্য দেখিয়া সাধুদের হৃদয়ে গঙ্গাভক্তি জাগরিত হইল।

শ্রীমহাপুরুষ (স্বামী অশোকানন্দের প্রতি সস্নেহে) — এখনই কি যাবে?

স্বামী অশোকানন্দ — না, আধঘন্টা পরে।

শ্রীমহাপুরুষ (পুনরায়) — স্বামীজী গঙ্গাজল এক বোতল পাঠাবার জন্য লিখেছিলেন। আমরা হিন্দু কি না!

যা, তোর success sure (বিজয় নিশ্চয়)। আর তুমি তো স্বামীজীর কাজের (লোক) — মনে আছে সেই আশীর্বাদ?

স্বামী অশোকানন্দ — হাঁ।

শ্রীমহাপুরুষ — রোঁমা রোলাঁ তোমাকে হয়তো নিমন্ত্রণ করবেন।

যেমন সকলে মনে করে স্বামীজীর প্রভাবে ঠাকুর বড়, স্বামী অশোকানন্দও তাই মনে করিতেন। মাদ্রাজে তাঁহার এই ভ্রম শ্রীমহাপুরুষ ভাঙ্গিয়া দিয়াছিলেন। সেই কথাই আজ স্মরণ করাইয়া দিলেন। বলিয়াছিলেন, ঠাকুর যুগাবতার আর স্বামীজী তাঁর প্রধান সেবক — অবতার নন, অবতারপ্রায়।

শ্রীমহাপুরুষ — শরীরটা তিনি ভাল রাখুন। আর, তাঁর যতদিন কাজ, ভাল রাখবেনও। এই দেখ, এই শরীর — কিছুই নেই এতে, খেতেও পারি না, কিন্তু কাজ করিয়ে নিচ্ছেন।

আমার বাবা, বিদ্যা বুদ্ধি বল ভরসা, সব ঠাকুর। তাঁর পায়ে আশ্রয়

দিয়েছেন, এই ভরসা। বিদ্যা বুদ্ধি এই ('না'-সূচক বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ সঞ্চালন)। বিদ্যাবুদ্ধি আমার কিছুই নেই। ঠাকুর, মা, স্বামীজী আমার ভরসা, তাঁরা আমার ভরসা।

স্বামীজীর কাজের জন্য স্বামী অশোকানন্দের শরীরটা ভাল যাহাতে থাকে তাহার জন্য শ্রীমহাপুরুষ প্রার্থনা করিলেন — ঠাকুর-মা-স্বামীজীকে। দুই বৎসর পূর্বে একজন সাধুর অসুখের সময়ও স্বামীজীর ঘরের দরজায় দাঁড়াইয়া শ্রীমহাপুরুষ প্রার্থনা করিয়াছিলেন, ঠাকুর এই শরীরটা ভাল করে দাও — ঠাকুর, মা, স্বামীজী, ভাল করে দাও।

সেই সাধুটি ভাবিতেছেন, তা'হলে কি আমায়ও কাজ করতেই হবে স্বামীজীর? কিন্তু আমার মনে যে আছে সাধনভজন করার কথা — সঙ্গে সামান্য কাজ!

স্বামী অশোকানন্দ আবার ভূমিষ্ঠ হইয়া বিদায়ের প্রণাম করিলেন। তিনি 'মহারাজের' ঘর দিয়া বাহির হইয়া গিয়া খোকা মহারাজকে বারান্দায় প্রণাম করিয়া আশীর্বাদ প্রার্থনা করিলেন। সেবক মতি আসিয়া তাঁহাকে প্রসাদ দিলেন।

২

ডায়েরী পাঠ চলিতেছে।

বেলুড় মঠ। সকাল ছয়টা। গ্রীষ্মকাল। গরম পড়িয়াছে। শ্রীমহাপুরুষ নিজ কক্ষে বসিয়া আছেন চেয়ারে, দক্ষিণ-পশ্চিম জানালার সম্মুখে গঙ্গা দর্শন করিতেছেন। আর যুক্ত করে 'জয় গঙ্গে পতিত পাবনী মা গঙ্গে' বলিয়া প্রণাম করিতেছেন। খালি গা। আজ গরম বেশী বলিয়া তাঁহার ঘরের ও সংলগ্ন পূর্বদিকের 'মহারাজের' ঘরের সব জানালা দরজা সেবকগণ খুলিয়া দিয়াছেন। গঙ্গার শীতল বায়ু কখনও গৃহে প্রবেশ করিয়া যেন চামর দোলানোর মত শ্রীমহাপুরুষের গায়ে ব্যজন করিতেছে। তিনি বালকের মত আনন্দে এক একবার বলিতেছেন — আঃ, কি শীতল বায়ু! কি পবিত্র! এতে কেবল শরীর নয় — মন প্রাণ অন্তরাত্মা, সব শুদ্ধ হয়ে যায়!

মঠবাসী সাধুগণ প্রতিদিনের মত আসিতেছেন আর ভূমিষ্ঠ প্রণাম

করিয়া চলিয়া যাইতেছেন। শ্রীমহাপুরুষ সকলকেই জিজ্ঞাসা করিতেছেন কুশলপ্রশ্নাদি অতি আনন্দে। এখন বিদ্যাপীঠের একজন সাধু আসিয়া প্রণাম করিতেই সহাস্য বদনে জিজ্ঞাসা করিলেন, ভাল আছ বাবা? গিছলে একদিন মাস্টারমশায়ের কাছে? কি বললেন তিনি, ভাল আছেন তো? পরপর এই সকল প্রশ্নের যথাযথ উত্তর সাধু দিতেছেন। সব শুনিয়া তিনি বলিলেন — আহা, ভাল থাকুন তিনি! ঠাকুরের লোক। কলির বেদব্যাস। 'চাপরাশ'-প্রাপ্ত লোক! ঠাকুর সঙ্গে করে এনেছেন, লোককে 'ভাগবত' শোনাতে। কত লোকের উপকার হচ্ছে। জগতের লোকের উপকার হচ্ছে তাঁর লেখা কথামৃতে। কত লোক সাধু হচ্ছে ঐ কথামৃত শুনে।

সাধুরা আসিতেছেন যাইতেছেন। এইবার কাশীর স্বামী হরানন্দ এবং মঠের কেহ কেহ বাহির হইয়া গেলেন।

আজ ১৭ই মে, ১৯৩১ খ্রীস্টাব্দ। ৩রা জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৮ সাল, রবিবার।

পরের দিন সোমবার। গতকালের মত আজও সকাল ছয়টার সময় শ্রীমহাপুরুষ নিজ কক্ষে চেয়ারে বসিয়া আছেন দক্ষিণ-পশ্চিম জানালার সম্মুখে। গরম অতিরিক্ত। তাই গৃহের সব জানালা দরজা উন্মুক্ত। পূর্ব দিকের 'মহারাজের' (স্বামী ব্রহ্মানন্দের) কক্ষেরও জানালা দরজা উন্মুক্ত। গঙ্গার শীতল বায়ু অবাধে প্রবাহিত। শ্রীমহাপুরুষ আনন্দময়, গরমে কষ্ট হইলেও। নগ্নদেহ। সাধুগণ আসিতেছেন, প্রণাম করিয়া চলিয়া যাইতেছেন। কাহারও সঙ্গে সহাস্য প্রসন্ন বদনে দুই চারিটা কথা কহিতেছেন।

বিদ্যাপীঠের সাধু আসিয়া প্রণাম করিতেই আজও জিজ্ঞাসা করিলেন, গিছলে মাস্টার মশায়ের কাছে এক আধ দিন? দুই হাতে মোটাপানের অভিনয় করিয়া বলিলেন, ওর সঙ্গে দেখা হয়েছিল? সাধু বলিলেন — কে শুকলাল বাবু? মহাপুরুষ আনন্দে জিজ্ঞাসা করিলেন, হাঁ দেখা হয়েছিল? সাধু উত্তর করিলেন, আজ্ঞে হাঁ। ওখানেই মাস্টার মশায়ের কাছেই দেখা হয়েছিল। রোজ আসেন ওখানে বেলেঘাটা থেকে। মহাপুরুষ বিস্ময়ানন্দে উত্তর করিলেন — রোজ? এখানটা অনেক দূর। তাই আসতে পারে না অত। আবার মোটা মানুষ। এই সাধুর সঙ্গে অনেক পূর্বে শুকলাল রায় মঠে আসিতেন। তাই মনোবিজ্ঞানের Law of

Association (সঙ্গনীতি) অনুসারে সাধুকে দেখিলে শুকলালবাবুর কথা মনে পড়িয়া যায়।

রাত্রি নয়টা। শ্রীমহাপুরুষ নিজের পালঙ্কের উপর উপবিষ্ট। নৈশ আহার করিতেছেন। সম্মুখে একটি ক্ষুদ্র টেবিল। তাহার উপর রহিয়াছে কাপ, সসার ও ন্যাপকিন। আহার অতি সামান্য — দুধ এক কাপ ও একটি সন্দেশ! সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছেন সেবক শৈলেশ ও মতি (স্বামী কৈলাসানন্দ ও শিবস্বরূপানন্দ)।

শরীর খুব রুগ্ন। কিন্তু আনন্দময় বালকের ভাব। চামচ দিয়া একটু একটু সন্দেশ ভাঙ্গিয়া লইতেছেন আর মুখে দিতেছেন। আর মাঝে মাঝে এক চামচ দুধ খাইতেছেন। আবার হাতে চামচ। অকারণ হাসিতেছেন। এটা বুঝি পরমহংসের হাসি! ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরের ছোট খাটে বসিয়া এরূপ অকারণ আপন মনে হাসিতেন।

সাধু আনন্দ ঠাকুরঘরের দক্ষিণের বারান্দায় বসিয়া জপধ্যান করিতেছিলেন। উঠিয়া দাঁড়াইতেই সম্মুখে দেখিলেন এই দেবদৃশ্য। মহাপুরুষ অকারণ নিজের মনে হাসিতেছেন, হাতে চামচ। আনন্দ ভাবিতেছেন, জগতে সুদুর্লভ এই বস্তু — ব্রহ্মদ্রষ্টা পরমহংস। আবার অবতারের অন্তরঙ্গ পার্ষদ। কেবল শাস্ত্র পড়িয়া অথবা সাধন করিয়া ব্রহ্মদ্রষ্টা সম্বন্ধে ধারণা হয় না, চোখে না দেখিলে। মহাপুরুষের দেহে অত কষ্ট। কিন্তু মন ব্রহ্মলীন, আনন্দময় ধামে বিচরণ করিতেছে। এদিকে আবার দেহপিঞ্জরে আবদ্ধ। দেহে আবদ্ধ, আবার অন্তরে মুক্ত — মহামায়া জগদম্বার এই বিচিত্র খেলা দেখিয়া বুঝি বাহ্য দৃষ্টিতে অকারণ এই পরমহংসের হাসি!

আজ ১৯শে মে, ১৯৩১ খ্রীস্টাব্দ, মঙ্গলবার। শ্রীমহাপুরুষ মহারাজ নিজ কক্ষে বসিয়া আছেন, খাটের উপর পশ্চিমাস্য। শরীর খুব খারাপ। হাঁফানি বাড়িয়াছে। সারারাত্রি নিদ্রা নাই। এরই মধ্যে যথারীতি মঠবাসী সাধুগণের প্রণাম গ্রহণ করিতেছেন। রাত্রিতে অত কষ্ট, কিন্তু সকালে প্রণাম গ্রহণ করিবার সময় যেন কষ্ট নামমাত্র। বলেন, স্বামীজী আমাদের আচার্যের স্থলে অভিষিক্ত করে গেছেন। সকলকে দেখতে হয় তাঁর স্থলবর্তী হয়ে। কখনও বলেন, ঠাকুর কৃপা করে তাঁর শ্রীচরণে স্থান দিয়ে এখানে রেখেছেন তাঁর আশ্রিত সন্তানদের দেখাশুনা করতে, আশ্রমবাসী

সকলের সংবাদ নিতে। কখনও বা বলেন, আমি মঠবাসী সকলের দাস, সেবক। কখনও কেলোকে (কুকুরকে) দেখাইয়া বলেন, এটা এটার (নিজের) কুত্তা। আর এটা (নিজে) ওটার (ঠাকুরঘর দেখাইয়া) কুত্তা। কখনও বলেন, আমি এখানকার (মঠের) চৌকিদার।

শরীর একেবারে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। এরই মধ্যে সকালে আচার্য ভাব! সাধুরা ঘরে আসিতে সঙ্কোচ বোধ করেন। এখন সকাল পৌনে ছয়টা। একজন সাধু দরজার বাহিরে দাঁড়াইয়া ইতস্ততঃ করিতেছেন গৃহে প্রবেশ করিবেন কি না। গৃহমধ্যে মহাপুরুষ কাশিতেছেন। মুখ দিয়া কফ নির্গত হইতেছে। আর রুমাল দিয়া নিজেই মুছিতেছেন। চোখে মুখে জল। কষ্ট অসহনীয়। কণ্ঠস্বর বিজড়িত। শৈলেশ ইঙ্গিতে গৃহে প্রবেশ করিতে বলিতেছেন। সাধু গৃহে প্রবেশ করিলেন। মহাপুরুষ মুখ তুলিয়া সাধুকে দেখিয়া বলিলেন কষ্টসূচক অস্পষ্ট স্বরে — এসো বাবা, প্রণাম করে যাও। ভাল আছ তো?

আজকাল মহাপুরুষের স্বভাব বালকবৎ অধীর। এই তুষ্ট, এই রুষ্ট। কিন্তু ভাববিপর্যয়ও চিত্তাকর্ষক আনন্দময় ও ব্রহ্মভাবোদ্দীপক।

সকাল ছয়টা। জ্যৈষ্ঠ মাস। একদল সাধু শ্রীমহাপুরুষের অনুমতি লইয়া দক্ষিণেশ্বর যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীচরণ-রজঃস্পৃষ্ট স্থানগুলি দর্শন করিবেন, এই সংকল্প। এই দলের গাইড হইলেন একজন সাধু, যিনি পূজ্যপাদ শ্রীম-র সঙ্গে, অথবা তাঁহার নির্দেশে এইসকল পবিত্র তীর্থস্থল অনেকবার দর্শন করিয়াছেন।

সাধুরা খেয়া নৌকায় গঙ্গা পার হইয়া পদব্রজে চলিয়াছেন উত্তর দিকে। এই দলে ছয়জন সাধু চলিয়াছেন। কাশী অদ্বৈতাশ্রমের স্বামী জগদানন্দ ও হরানন্দ। ঢাকা মঠের স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ, বেলুড় মঠের স্বামী গোপালানন্দ আর দেওঘর বিদ্যাপীঠের স্বামী নিত্যাত্মানন্দ ও ব্রহ্মচারী সাধন চৈতন্য।

সাধুগণ প্রথম দর্শন করিলেন ঈশান কবিরাজের বাড়ি বরানগরে। ইনি শ্রীম-র ভগিনীপতি। ইঁহার বাড়িতে থাকিয়াই শ্রীম প্রথম ঠাকুরকে দর্শন করেন। কবিরাজ মহাশয় ঠাকুরের চিকিৎসক। তারপর দর্শন করিলেন জয় মিত্রের গঙ্গারঘাট ও মণি মল্লিকের বাগানবাড়ি। এবার দর্শন করিলেন

নটবর পাঁজার তেলের কলের স্থান আলমবাজারে। নটবর ঠাকুরকে ভালবাসিতেন। বালক কালে তিনি অপরের গরু চরাইতেন। তখন কালীবাড়িতে ঠাকুরের কাছে বসিতেন। স্বহস্তে তামাক সাজিয়া ঠাকুরকে খাওয়াইতেন, আর নিজেও খাইতেন। পরে ঠাকুরের কৃপায় বড়লোক হন এবং তেলের কল করেন। রাস্তার উপরই শম্ভু মল্লিকের বাগানবাড়ি। ইনি ঠাকুরের দ্বিতীয় রসদদার। মথুরবাবুর শরীরত্যাগের পর ইনি ঠাকুরের সেবা করিতেন। ইনিই ঠাকুরকে বাইবেল শুনাইতেন। ইঁহার গৃহ হইতে অঞ্চলে আফিং বাঁধিয়া দিলে এই বাগানেই ঘুরিতে থাকেন ঠাকুর। তখন বলিলেন, 'এটা খুলে নেও।' খুলিয়া লইতেই শান্ত। কালীবাড়িতে গেলেন। পূর্ণ সন্ন্যাসের অবস্থা ছিল তখন। বাহিরে ও ভিতরে ত্যাগ, সম্পূর্ণ ত্যাগ! এবার দর্শন করিলেন যদু মল্লিকের বাগানবাড়ি। যদুবাবুর সখ্য ভাব ছিল। এখানে প্রায়ই মল্লিক মহাশয় আসিতেন। তখন ঠাকুরকে ডাকিয়া লইতেন। এই বাড়িতে বৈঠকখানায় ক্রাইস্টকে জীবন্ত দর্শন করিয়াছিলেন ঠাকুর। দেওয়ালে বিলম্বিত ক্রাইস্টের ছবি জ্যোতির্ময় রূপ ধারণ করিয়া ঠাকুরের দেহে আসিয়া প্রবেশ করিয়াছিলেন। এবার সাধুগণ ফটকে প্রণাম করিয়া প্রবেশ করিলেন দক্ষিণেশ্বর তপোবনে, যেখানে ভবতারিণী কালী ত্রিশ বৎসর জ্যোতির্ময় দিব্যদেহে ঠাকুরের সঙ্গে অগণিত লীলাবিলাস করিয়াছিলেন। কখনও মা, রাম, কৃষ্ণ, শিব, কালী প্রভৃতি সাকার রূপে বিলাস করিতেন। কখনও নিরাকার নির্গুণ সচ্চিদানন্দরূপ অরূপে বিলাস করিতেন।

মাতা ভবতারিণী, রাধাকান্ত ও ঠাকুরের বাসগৃহ এবং শিবমন্দিরে প্রণাম করিয়া সাধুগণ মায়ের বাসস্থান ন'বত, পঞ্চবটি ও বটতলা কুঠি এবং বেলতলা প্রভৃতি স্থান দর্শন ও প্রণাম করিয়া ঠাকুরের সাধনস্থল সিদ্ধপীঠ বটতলায় বসিয়া ধ্যান করিলেন। তন্ত্রসাধনের সিদ্ধপীঠ বেলতলায়ও ধ্যান করিলেন।

সাধুগণ রামলাল দাদাকে দর্শন করিবার জন্য তাঁহার বাড়িতে গিয়া উপস্থিত হইলেন। ইনি মা ভবতারিণীর প্রধান সেবক ও ঠাকুরের ভ্রাতুষ্পুত্র। দাদা সাধুগণকে দেখিয়া পরম আত্মীয়ের মত তাঁহাদিগকে অভ্যর্থনা করিলেন হর্ষানন্দে। কুশলপ্রশ্নাদির পর ঠাকুরের লীলামৃত সম্বন্ধে

কথোপকথন হইতে লাগিল।

সাধুগণ — দাদা, আমাদের ঠাকুরের সম্পর্কে কিছু শোনান।

দাদা — ঠাকুর ছিলেন সময়ে দিনরাত কাজ করতুম তাঁর আজ্ঞায়। কালীঘর ও বিষ্ণুঘরের পূজো, ঠাকুর ও ভক্তদের সেবা। তাঁদের বাসস্থান ও আহারের ব্যবস্থা। শৌচাদির স্থাননির্দেশ। নৃত্যগীত রঙ্গরসাদির অভিনয়, কত কি! অত পরিশ্রম দিনরাত্রি, কিন্তু কষ্টবোধ মোটেই হতো না। তাঁর সান্নিধ্যে সকলের মন যেন সদা আনন্দসাগরে ভাসমান থাকতো। কি আনন্দময় পুরুষ যে তিনি ছিলেন, তা তো ভাই সব বর্ণনা করতে পারবো না! আমার সে ভাষা নেই। কিন্তু হৃদয় এখনও পরিপূর্ণ হয়ে যায় সেই আনন্দে, স্মৃতিমাত্রেই! কেবল আমারই নয়, সকলেরই — যাঁরা তাঁর সান্নিধ্যে আসতেন, এরূপ আনন্দময় ভাব হতো। এ সবই তাঁর উপস্থিতিতে। তিনি নিজে আনন্দময়, তাই ওখানে সদানন্দের হাট।

একজন সাধু — আচ্ছা দাদা, ঠাকুরের নিত্যসেবা কি করতেন?

দাদা — সব কথা তো অনন্ত। তবে মোটামুটি দু'চারটে বলছি। ঠাকুরকে প্রসাদ খাইয়ে তামাক সেজে দিতাম। তারপর খেতে যেতাম। ফিরে এসে দেখতাম তামাক খেয়ে ঠাকুর হুঁকো ঠিকস্থানে রেখে দিয়েছেন। কখনও আহারের পর পায়ে হাত বুলাতে হতো। হাত বুলোচ্ছি, কিছুক্ষণ পর ঠাকুর পা তুলে নিয়ে বলতেন, 'যা যা, তুই একটু গড়াগে যা।' শরীর থেকে আলস্য তুলে নিয়ে গিছলেন ঠাকুর। দিনরাত খাটুনি, অনবরত খাটুনি, কিন্তু বিন্দুমাত্র ক্লান্তিবোধ নেই। এখন বেশ বুঝতে পারছি আমার শক্তিতে কাজ করিনি। তাঁর শক্তিতে এই শরীরে কাজ করেছি।

সাধু — দাদা, এখন আপনার বয়স কত? ঠাকুরের সময় কত ছিল?

দাদা — এখন বাহাত্তর তিয়াত্তর। তখন ছিলাম আঠার উনিশ বছরের ছোকরা।

সাধু — কয় বছর সেবার সুযোগ পেয়েছিলেন?

দাদা — প্রায় বছর পনের।

সাধু — রাণী রাসমণি ও মথুরবাবুকে দর্শন করেছিলেন কি?

দাদা — না। এক দেড় বছর হয় তাঁরা দেহ রেখেছেন, তখন যাই। জগদম্বা, দ্বারকা ও ত্রৈলোক্যকে, (মথুরের পত্নী ও পুত্রদ্বয়) এঁদের

দেখেছি।

সাধু — ঠাকুরের সঙ্গে আপনার কথাবার্তা কি কিছু মনে আছে?

দাদা — হাঁ। কখন বলতাম আপনার স্বরূপ দেখিয়ে আবার ঢেকে ফেলেন কেন? সর্বদাই ঐ ভাব থাকুক না! ঠাকুর হেসে বলতেন, 'তাহলে আমার হাগার জল দেবে কে? তুইও এমনি (ভাবস্থ) হয়ে থাকবি।' আবার কখনও বলতেন, 'কি করবি তুই আর? এখানকার সেবা করছিস্, ভক্তদের সেবা করছিস্। এমন মা ভবতারিণী — সাক্ষাৎ চিন্ময়ী চৈতন্যময়ী মা রয়েছেন, তাঁর সেবা করছিস্, আর কি চাস্?' এইসব কথা হতো।

সাধু — এই বাড়িতে মা-ঠাকরুণ এসেছিলেন কি?

দাদা — হাঁ। তখন বাড়ি শেষ হয়েছে মাত্র — সব অপরিষ্কার। তাতেই আসেন। যোগীন মা, গোলাপ মা, মাস্টার মশায়ের স্ত্রী, শরৎ মহারাজ ও মাস্টার মশায় — মাকে অগ্রগামিনী করে ঢোকেন। আমি পিছু পিছু ঢুকলুম্।

লক্ষ্মী বলতো — দাদা, ভগবান এখানে আমাদের দু'টি জিনিস দিয়েছেন — মা গঙ্গা আর মা কালীর ধ্বজাদর্শন। এখানকার মধ্যে এ দু'টিই সার। কলিতে সর্বপাপনাশিনী গঙ্গা। তা, আমাদের দর্শন হয় দোতলার ছাদ থেকে।

সাধুগণ দাদাকে প্রণাম করিয়া বিদায় লইলেন। এখন বেলা সাড়ে আটটা। যে পথে গিয়াছিলেন সেইপথেই তাঁহারা ফিরিয়া আসিলেন কুঠিঘাটে। খেয়ায় গঙ্গা পার হইয়া মঠাঙ্গনে প্রবেশ করিলেন সাড়ে এগারটায়।

৩

২৩শে মে ১৯৩১ খ্রীস্টাব্দ, শনিবার।

পাঁচদিন শ্রীম-র পদচ্ছায়ায় বাস করিয়া অন্তেবাসী বেলা দশটায় বেলুড় মঠে ফিরিয়াছেন।

এখন রাত্রি নয়টা। একজন সাধু ঠাকুরঘরের পূর্ব বারান্দায় বসিয়া ধ্যানজপ করিয়াছেন। এখন তিনি উঠিয়া দাঁড়াইয়াছেন। সম্মুখে এক অপরূপ দৃশ্য দেখিলেন তিনি। ঠাকুরঘরের পূর্বদিকে মঠভবনের উত্তর-

পশ্চিম অঞ্চলে শ্রীমহাপুরুষের বাসগৃহ। মহাপুরুষ নিজের পালঙ্ক হইতে অবতরণ করিয়া সেবকদের সাহায্যে মেঝেতে দাঁড়াইয়া আছেন। দিগম্বর শিশু — পরমহংস-মূর্তি, সম্পূর্ণ নিঃসঙ্কোচ! গলদেশে কবচসংযুক্ত ঘুন্‌সি ঝুলিতেছে।

২৪শে মে ১৯৩১ খ্রীস্টাব্দ, রবিবার।

সকাল ছয়টা। শ্রীমহাপুরুষ পালঙ্কোপরি উপবিষ্ট একা, উত্তরাস্য। মেরুদণ্ড কিঞ্চিৎ বাঁকিয়া গিয়াছে, বয়স ও রোগের প্রতিক্রিয়ায়। একজন সাধু দক্ষিণ দিকের দরজায় দাঁড়াইয়া দর্শন করিতেছেন। উদ্দেশ্য প্রণাম করা। সেবক শংকর ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া গৃহে প্রবেশ করিলেন। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন — কে দাঁড়িয়ে? শংকর উত্তর করিলেন, জগবন্ধু। এই সুযোগে ইনি গিয়া ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিলেন। অত কষ্টেও করুণামাখা স্বরে বলিলেন — ও জগবন্ধু, জগবন্ধু ভাল আছ? কথা অস্পষ্ট ও বিজড়িত। কথা মাত্র দুইটি। কিন্তু করুণায় সিঞ্জিত। এইটিই বুঝি চিহ্ন পরমহংস বিদেহী মহাপুরুষদের! তাঁহাদের অন্তরাত্মা দেহজ্ঞানের বহু উর্ধ্বে। মন বুদ্ধি উহাতে নিমজ্জিত প্রায় সবটা। অল্পমাত্র দেহে।

২৫শে মে, ১৯৩১ খ্রীস্টাব্দ, সোমবার।

বেলুড় মঠ। সকাল ছয়টা। গরম চলিতেছে। শ্রীমহাপুরুষ নিজের খাটে বসিয়া আছেন। সেবক শংকর ও শৈলেশ খাটের উত্তর দিকে দাঁড়াইয়া আছেন। ঢাকার হেম মহারাজ ও মঠের নীলকণ্ঠ মহারাজ টেবিলের সামনে দাঁড়াইয়া। সাধুগণ প্রণাম করিতেছেন, আর মঠের কাজে চলিয়া যাইতেছেন। ইহাতেই সাধুগণের হৃদয় আনন্দে পরিপূর্ণ হইতেছে। একজন সাধু ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিতেছেন। মহাপুরুষ মহারাজ বলিলেন, কে রে? সাধু মাথা তুলিতেই হাসিতেছেন।

সাধুও হাসিতেছেন। সেবকদের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিতেছেন, লোক ভাল। বি.এ, বি.এল, পড়েছে। মনে মনে হাসিতেছেন আর প্রসন্নভাবে কি বলিতেছেন। কথা অস্পষ্ট, কেহ বুঝিতে পারে না। আজকাল কথা মুখ দিয়া সব বাহির হয় না। কতক কথা অস্পষ্ট, আর কিছু কথা নিজে নিজে বিড়বিড় করিয়া বলেন। যাহা বলিতে চান, তাহা প্রকাশ করিতে পারেন না। বালকের স্বভাব। কিন্তু মুখমণ্ডলের দিব্য ছবি অন্তরের

সরস করুণাময় ভাব প্রকাশ করে।

১লা জুন ১৯৩১ খ্রীস্টাব্দ, সোমবার।

বেলুড় মঠ। সকাল সওয়া ছয়টা। শ্রীমহাপুরুষের গৃহের সম্মুখে একজন সাধু দাঁড়াইয়া আছেন। তিনি পরমহংসমূর্তি দর্শন করিতেছেন। আজ মহাপুরুষের শরীর অপেক্ষাকৃত ভাল। তিনি চেয়ারে বসিয়া আছেন দক্ষিণাস্য, নগ্নদেহ আর গলায় ঘুনসীতে কবচ বাঁধা। তাঁহার পিছনে আলমারী আর ডান হাতে পাথরের টেবিল। টেবিলের উপর কথামৃত সাজান রহিয়াছে।

মঠবাসী সাধুগণ আসিতেছেন আর প্রণাম করিয়া চলিয়া যাইতেছেন। মহাপুরুষ সকলকেই কুশলপ্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছেন, ভাল আছ? প্রসন্ন ভাব — আনন্দময় বালক। এইবার উঠিয়া গিয়া বিছানায় বসিলেন পশ্চিমাস্য। একজন সাধু প্রণাম করিতেছেন ভূমিষ্ঠ হইয়া। মুখ তুলিলে তিনি বলিলেন — ভাল আছিস? আর অভয় মুদ্রায় হাত তুলিয়া আশীর্বাদ করিতেছেন।

স্বামী ব্রজেশ্বরানন্দ সম্মুখে দাঁড়ান। তাঁহাকে বলিতেছেন, লিচু আম সব নিয়ে যাও। কল্যাণেশ্বরকে পূজো দাও। হাঁ, খুব ভাল করে পূজো দাও। ঐ আসল। হাঁ, লিচু বেশী করে নিয়ে যাও। মুজঃফরপুরের লিচু। হাঁ, ন্যাও — বেশী করে ন্যাও। ভাবে গদগদ শ্রীমহাপুরুষ।

ঠাকুর-ভাণ্ডারের সেবক গঙ্গাচরণের প্রবেশ। তাহাকে দেখিয়া প্রসন্নভাবে বলিলেন, এই এক বুড়ো — এমন করে থাকে (হাস্য)। গঙ্গাচরণ স্পষ্টবাদী, কথায় পরিপক্ক। ভক্তিমান লোক।

এখন রাত্রি নয়টা। একজন সাধু আরতির পর ঠাকুরঘরের দক্ষিণের বারান্দায় জপধ্যান করিতেছেন পশ্চিমের দরজার কাছে, উত্তরাস্য। রাত্রির ভোগ উঠিয়াছে, দরজা বন্ধ হইয়া গেল।

সাধু উঠিয়া আসিয়া পূর্ব বারান্দায় দাঁড়াইলেন জানালার কাছে। সম্মুখে মঠভবন। তাহার উত্তর-পশ্চিম কোণে মহাপুরুষ মহারাজের গৃহ। তাহার পর গঙ্গা। সাধু মহাপুরুষকে দর্শন করিতেছেন।

মহাপুরুষ আহার করিতে বসিয়াছেন খাটে, পশ্চিমাস্য। আহার্য অতি সামান্য। সামনে একটি ছোট টেবিলে শুভ্র বস্ত্রে আবৃত। তাহার উপর এক

কাপ মনাক্কামিশ্রিত দুধ সসারের উপর। আর একটি চামচ। কখনও চামচ দিয়া দুধ তুলিয়া মুখে দিতেছেন। কখনও বা কাপ তুলিয়া চুমুক দিয়া খাইতেছেন। কখনও মুখ হইতে মনাক্কার বীচি চামচ দিয়া ফেলিতেছেন সসারে।

আজ কৃষ্ণপক্ষের প্রতিপদ তিথি। আকাশে চাঁদ উঠিয়াছে, প্রায় পূর্ণ। এখন মঠভবনের ঠিক উপরে। মাঝে মাঝে মেঘের দুই একটা টুকরা চাঁদকে ঢাকিতেছে, আবার মুক্ত করিতেছে। কৃষ্ণ মেঘের রসক্রীড়া চলিতেছে শুভ্র চন্দ্রিমার সঙ্গে। মনোহর দৃশ্য। মঠভবনের সংলগ্ন পশ্চিম দিকে একটি আম্রবৃক্ষ। ইহার ছায়াতলে ‘স্বামীজী’, ‘মহারাজ’, বাবুরাম মহারাজ প্রভৃতি মঠবৃদ্ধগণ সর্বদা বসিতেন। বৃক্ষটি যেন একটি জীবন্ত জীব। কর্মবশে এই বৃক্ষ-শরীর ধারণ করিয়া আছে বেদের সিদ্ধান্ত অনুসারে — ‘স্থাণুমন্যেঽনুসংযন্তি যথাকর্ম যথাশ্রুতম্’ (কঠোপনিষৎ ৫-৭) — ভাগবতের যমলার্জুনের ন্যায়। এবার ইহার বিমুক্তি নিশ্চয়। তাই তো এই আম্রবৃক্ষ এই মুক্তক্ষেত্রে অবস্থিত। এই পুণ্যভূমি অবতার ও পার্ষদগণের চরণরজঃসমৃদ্ধ জীবন্মুক্ত মহাপুরুষগণের দ্বারা অধ্যুষিত। তাঁহাদের পবিত্র স্পর্শ ও সপ্রেম দিব্যদৃষ্টি উহার উপর নিপতিত। ধন্য বৃক্ষ! এই বৃক্ষের ঘন পত্রাচ্ছাদিত একটি শাখা যেন মস্তকোত্তোলন করিয়া উপরে উঠিয়া তাহার বিমুক্তির সংবাদ চন্দ্রমাকে আনন্দে জ্ঞাপন করিতেছে। আনন্দধাম এই বেলুড় মঠ!

এই আনন্দময় ধামে আনন্দমূর্তি শ্রীমহাপুরুষকে দর্শন করিতেছেন একটি সাধু ঠাকুরঘরের বারান্দায় দাঁড়াইয়া। গৃহে বৈদ্যুতিক আলো জ্বলিতেছে। সেবক মতি কখনও হাতপাখায় বাতাস করিতেছেন মহাপুরুষকে। কখনও দক্ষিণ-পশ্চিম জানালায় দাঁড়াইয়া দেখিতেছেন হাওয়া চলিতেছে কিনা, শ্রীমহাপুরুষের অনুজ্ঞায়।

গৃহের উত্তর পশ্চিমের জানালার একটি পাট ভেজান রহিয়াছে। জানালার উপরে একটি ছোট পর্দা গুটান রহিয়াছে।

শ্রীমহাপুরুষের খাটে মশারী খাটান হইয়াছে। কিন্তু তাহা উপরে খাটদণ্ডে তুলিয়া রাখা হইয়াছে। খাট উত্তর-দক্ষিণ লম্বমান — গৃহের পূর্ব দেয়াল ঘেঁষা। খাটের পাশে পূর্ব দেয়ালে মাতা মেরীর একটি বাঁধান ছবি

দেখা যাইতেছে। আর স্বামী ব্রহ্মানন্দের গৃহের পশ্চিম দরজার উপর পূর্ব-দক্ষিণ কোণের দিকে ভগবান বিষ্ণুর ছবি দেয়ালে লম্বমান।

ঠাকুর মন্দিরে ঠাকুর আহার করিতেছেন, সুজির পায়েস ও লুচি। ইহাই ঠাকুরের রাত্রির আহার। সব দরজা বন্ধ। পূজারী দক্ষিণ বারান্দায় পায়চারী করিতেছেন আর উত্তরীয়ের ভিতর বক্ষস্থলে জপমালায় ইষ্টমন্ত্র জপ করিতেছেন। মঠ-আঙ্গিনার পূর্ব দিকে মা গঙ্গা আনন্দে প্রবাহিতা। সব নীরব ও নিস্তব্ধ। এক অপূর্ব প্রাণস্পর্শী বাতাবরণ! এক দিব্য প্রশান্ত গম্ভীর ভাব!

সেবক গঙ্গাচরণ ঠাকুরের জন্য সুগন্ধ তাম্রকূট লইয়া আসিয়াছেন। পূজারী দরজা খুলিয়া মন্দিরে প্রবেশ করিলেন। আর তাম্রকূট নিবেদন করিলেন। দরজা পুনরায় বন্ধ। মন্দিরের চারিদিকে মৃদু অন্ধকার। বাহিরে চাঁদের আলো। গঙ্গার জলে চন্দ্রকিরণ পড়িয়াছে। জল গলিত রৌপ্যের ন্যায় ঝকমক করিতেছে। অল্পক্ষণ মধ্যে মন্দিরের পূর্ব দরজা খোলার সঙ্গে সঙ্গে বারান্দা আলোকিত হইল।

নিম্নে অঙ্গনে স্বামী জগদানন্দ দাঁড়াইয়া আছে। তিনি এক একবার ঠাকুরমন্দিরে, এক একবার শ্রীমহাপুরুষের গৃহে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছেন। এইবার তিনি মঠভবনের পশ্চিমের চায়ের বারান্দা দিয়া পূর্ব দিকের গঙ্গার বারান্দায় চলিয়া গেলেন।

ঠাকুরমন্দিরের পূর্ববারান্দায় দাঁড়াইয়া একটি সাধু আনন্দে ভাবিতেছেন, এখানে আহার করিতেছেন ভগবান ঠাকুর, আর ওখানে আহার করিতেছেন তাঁহার প্রিয় সন্তান, সিদ্ধ পরমহংস বালক শ্রীমহাপুরুষ।

সাধু আবার ভাবিতেছেন, যথার্থ শান্তিসুখ পাইতে হইলে মানুষকে নিজের অহংকারটাকে কাহারও পায়ে নমিত করিতে হইবে। যতদিন শরীর শক্ত থাকে ততদিন সাধক 'আমি আত্মা' 'আমি ব্রহ্ম' — এই ভাব নিয়া জন্মগত বহির্মুখী সংস্কারের সঙ্গে সংগ্রাম করে। যখন শরীর বৃদ্ধ ও অবসন্ন হয় তখন ভক্তের ভাবে ভগবানের মহামায়ার শরণাপন্ন হয়। ভগবানের বিগ্রহে, ছবিতে ভগবানের আবির্ভাব ভাবিয়া তাঁহার কাছেও শরণাগত হয়, মাথা নিচু করে। ভগবানের চরণে মস্তক নমিত করিলে, দুঃখ কষ্ট নিবেদন করিলেই শান্তি। ঠাকুর নিজমুখে বলিয়াছেন, 'আমার চিন্তা কর, আমায়

ধর, আমি সব করে দেব।' 'কর্তা সাজ, শান্তি পাবে না। শরণাগতিতে শান্তি।'

শান্তির সকল প্রকার আয়োজন মঠে বেশ বিদ্যমান। ঠাকুর-মা-স্বামীজী যেন জীবন্ত রহিয়াছেন। শ্রীমহাপুরুষ ও ঠাকুরের অন্য পার্যদ কেহ কেহ সশরীরে রহিয়াছেন। পাশে মা গঙ্গা। আর অতগুলি উচ্চকোটি সাধক সাধু রহিয়াছেন। সবই উদ্দীপক।

দেওঘর বিদ্যাপীঠে এসবের অভাব। তবে বাবা বৈদ্যনাথের মন্দিরে জমাটবাঁধা শান্তি রহিয়াছে। কিন্তু মঠে ঠাকুর নিজের কথায় নিজে বাঁধা। স্বামীজীকে বলিয়াছিলেন, 'আমায় মাথায় করে যেখানে বসাবে সেখানে থাকবো।' আর অগণিত সাধু ভক্তের শ্রদ্ধাভক্তিতেও ঠাকুর বাঁধা। সাক্ষাৎ জীবন্ত দেবমানবে, ছবিতে বা প্রতিমাতে ভক্তিভরে ব্যাকুল প্রাণে মস্তক নত করিলেই শান্তি। এটাই সহজ পথ।

দেবমানব শ্রীমহাপুরুষকে ও মঠের দিব্যদৃশ্য দর্শন করিতে করিতে, আর এই সকল দিব্যভাবনা মনে ভাবিতে ভাবিতে সাধু মন্দির হইতে অবতরণ করিলেন ও গঙ্গার বারান্দায় গিয়া বেঞ্চিতে বসিয়া রহিলেন।

সম্মুখে পতিত পাবনী গঙ্গা। চন্দ্রকিরণে উদ্ভাসিতা। প্রেমাস্পদমিলনে আনন্দচঞ্চলা।

৩রা জুন ১৯৩১ খ্রীস্টাব্দ, বুধবার।

বেলুড় মঠ। সকাল সওয়া ছয়টা। শ্রীমহাপুরুষ নিজের খাটে বসিয়া আছেন পশ্চিমাস্য। সাধুরা আসিতেছেন আর প্রণাম করিয়া চলিয়া যাইতেছেন। সকলেরই কুশল জিজ্ঞাসা করিতেছেন। কাহারও সঙ্গে রঙ্গরস করিতেছেন। এখন স্বামী ওঁকারানন্দ গৃহে প্রবেশ করিলেন। তারপর মালাবারের বালকৃষ্ণণ। মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে বি.এ. পাশ করার পর তাহার মাতা তাহাকে মঠে লইয়া আসেন এবং শ্রীমহাপুরুষ মহারাজের পায়ে সমর্পণ করেন এই বলিয়া — 'এটি আমার বৃক্ষের প্রথম ফল। শ্রীগুরু মহারাজের (ঠাকুরের) সেবায় সমর্পণ করিলাম।' আহা, কিরূপ দেবী মা! কোন মা কাঁদেন ছেলে সাধু হইলে। আর এই মা পরমানন্দে পুত্রকে শ্রীভগবানের চরণে সমর্পণ করিলেন। বালকৃষ্ণণ শ্রীমহাপুরুষ মহারাজকে প্রণাম করিয়া উঠিল। তাহার সহিত তিনি রঙ্গরস

করিতেছেন। বলিলেন, ‘পের এন্না’ (কি নাম তোমার)? (হাস্য)।

শ্রীম — মঠ যেন জীবন্ত নাট্যশালা! নটরাজ হলেন ঠাকুর, অবতার। তাই মঠের সব সংবাদ দেবত্বের সংবাদ। সর্বস্ব ছেড়ে সাধুরা অবতারের আশ্রয় নিয়েছেন। মঠের ধূলিকণা পবিত্র।

শরণাগতি কাকে বলে মহাপুরুষের জীবন দেখলে বোঝা যায়। অত অসুখ কিন্তু কর্মের বিরাম নাই। সকলের কল্যাণ চিন্তা করছেন। রোগ যন্ত্রণায় সারারাত নিদ্রা নাই। কিন্তু এরই মধ্যে সকালে বসে সাধুদের স্নেহাশিস্ বিতরণ করছেন। সকলের সংবাদ নিচ্ছেন। আবার নিষ্কাম কর্মের দৃষ্টান্তও মহাপুরুষ। শরীর যায় যাক্, তবুও ঠাকুরের নাম প্রচার করছেন। অত বড় সঙ্ঘ, তার মঙ্গল চিন্তা করছেন। এই সবই ঠাকুর আসায় দেখা যাচ্ছে। শোনা যাচ্ছে।

ঠাকুরবাড়ি। গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেন, কলিকাতা।
৯ই জুন ১৯৩১ খ্রীস্টাব্দ, মঙ্গলবার।

বিংশ অধ্যায়

পরীক্ষা

১

মর্টন স্কুল। পঞ্চাশ নম্বর আমহার্স্ট স্ট্রীট। অপরাহ্ন সাড়ে পাঁচটা। গ্রীষ্মকাল; বেশ গরম। আজ যেন গুমোট গরম। অন্তেবাসী বেলুড় মঠ হইতে আসিয়াছেন। শ্রীম নিজকক্ষে অর্গলবদ্ধ হইয়া বিশ্রাম করিতেছেন।

আজ ১৮ই জুন ১৯৩১ খ্রীস্টাব্দ। ৩রা আষাঢ় ১৩৩৮ সাল, বৃহস্পতিবার।

শ্রীম সাড়ে ছয়টায় ছাদে আসিলেন। একজন সাধু ও কয়েকজন ভক্ত বসা। সকলে উঠিয়া শ্রীমকে অভিবাদন করিলেন যুক্ত করে। শ্রীম ঘর হইতে বাহির হইয়া যুক্ত করে 'নমস্কার, নমস্কার' বলিতে বলিতে ছাদে আসিলেন। আপনারা একটু বসুন, এই বলিয়া পুনরায় তিনতলায় নামিতেছেন। হাত মুখ ধুইয়া ছাদে উঠিলেন সাতটায়!

শ্রীম আবার গৃহে প্রবেশ করিতেছেন। পূর্ণেন্দু আগে আগে লণ্ঠন লইয়া যাইতেছেন। ঘরের দেওয়ালে বিলম্বিত দেবদেবীর ছবিকে আলো দেখাইতেছেন পূর্ণেন্দু। আর শ্রীম যুক্ত করে একে একে সকলকে নমস্কার করিতেছেন। দেওয়ালের গায়ে একটি খোল টাঙ্গানো আছে। শ্রীম উভয় হস্তে তাহাতে মৃদু চাঁটি দিতেছেন।

এবার ছাদের উত্তর প্রান্তে পুষ্পকাননে তুলসী তলায় প্রণাম করিয়া একটি আসনে উত্তরাস্য বসিলেন। ধ্যান করিতেছেন। শ্রীম-র পশ্চাতে বসিয়া আছেন একটি সাধু। তিনি আপন মনে ভাবিতেছেন, কাল আমি চলিয়া যাইব দেওঘর বিদ্যাপীঠে। আহা, আজ কি সৌভাগ্য আমার, ঠাকুর! আপনার স্বহস্তে নির্মিত একজন বিশেষ পার্ষদ আমার সম্মুখে বসিয়া আছেন! তিনি অতি প্রবীণ, পূজনীয় ও প্রিয়।

আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। দুই এক বিন্দু বারিপাত হইতেছে। সাধু উঠিয়া

গিয়া শ্রীম-র ঘর হইতে ছাতা লইয়া আসিলেন। খানিকপর শ্রীম উঠিয়া গিয়া সিঁড়ির ঘরে বসিলেন চেয়ারে, দরজার পাশে দক্ষিণাস্য। ইতিমধ্যে অনেকগুলি ভক্ত আসিয়া জুটিয়াছেন। স্বামী রাঘবানন্দ ও স্বামী ধীরাত্মানন্দও আসিয়াছেন। মহীশূরের ভক্ত শ্রীমুদালিয়ার আজও আসিয়াছেন।

অন্তেবাসী শ্রীমকে মহাপুরুষ মহারাজের ডায়েরী শুনাইতেছেন।

১০ই জুন ১৯৩১ খ্রীস্টাব্দ, বুধবার।

বেলুড় মঠ। গ্রীষ্মকাল। সকাল ছয়টা বিশ। শ্রীমহাপুরুষ মহারাজের গৃহ। মহাপুরুষ খাটে বসিয়া আছেন পশ্চিমাস্য। একটি সাধু গৃহে প্রবেশ করিলেন। তিনি ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া উঠিয়াছেন। শ্রীমহাপুরুষ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন — ভাল? (কথা জড়াইয়া যায় — অস্পষ্ট) এই কয়দিন কোথায় ছিলে? ততক্ষণ সাধু দরজার নিকট আসিয়াছেন। তিনি খাটের নিকট পুনরায় আসিয়া উত্তর করিলেন — কলকাতায়, স্টুডেন্টস্ হোমে দু'দিন—। বাকী কথা শেষ হইবার পূর্বেই শ্রীমহাপুরুষ উত্তর করিলেন, বেশ বেশ! কথামাত্র দুইটি, কিন্তু নিবিড় করুণামাখা। শ্রোতার মনপ্রাণ আনন্দে পরিপূর্ণ। গৃহে মাতাপিতার স্নেহমাখা কথায়ও এই দৈবী করুণা ও অভয় স্পর্শের অভাব।

১১ই জুন ১৯৩১ খ্রীস্টাব্দ, বৃহস্পতিবার।

বেলুড় মঠ। শ্রীমহাপুরুষের গৃহ। সকাল পৌনে ছয়টা। শ্রীমহাপুরুষ পশ্চিম-দক্ষিণ জানালার কাছে চেয়ারে বসিয়া আছেন পূর্বাস্য। 'মহারাজের' ঘরের দুইটি দরজা খোলা। তিনি গঙ্গা দর্শন করিতেছেন। পা দুইখানি অল্প স্ফীত, কার্পেটের উপর স্থাপিত। বাহ্য চক্ষু দুইটি মা গঙ্গার উপর নিক্ষিপ্ত। কিন্তু অন্তর্চক্ষু বুঝি ব্রহ্মলীন। মুখমণ্ডল দিব্য রশ্মিতে মণ্ডিত। একটি সাধু দরজার বাহিরে দাঁড়াইয়া মহাপুরুষের আননে প্রতিফলিত দৃশ্য ও অদৃশ্য, জগৎ ও ব্রহ্মের একত্র সংযোগ একই সময়ে একই আধারে বিস্মিত হইয়া দর্শন করিতেছেন। সাধু ভাবিতেছেন, এই তো ব্রহ্মদর্শন! আমরা সত্যই মহা ভাগ্যবান। অবতার আসায় এই দুর্লভ দৃশ্য অতি সহজে অনায়াসে দর্শন হইতেছে।

একজন সাধু প্রণাম করিতে আসিয়াছেন। গৃহে কেহ নাই। কিন্তু

মহাপুরুষের এই দিব্যভাব দেখিয়া তিনি উহা উপভোগ করিতেছেন। একজন সেবক গৃহে প্রবেশ করিতেছেন। তিনি বলিলেন — আসুন প্রণাম করে যান। তাঁহার এই কথায় মহাপুরুষের উন্মনা সমাধি ভঙ্গ হইল। সাধু গৃহে প্রবেশ করিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন। মহাপুরুষ বলিলেন — জগবন্ধু, ভাল আছ? হাত তুলিয়া ইঙ্গিতে জিজ্ঞাসা করিলেন, কোথায় গিছলে এই কয় দিন? গতকালও এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। সাধু উত্তর করিলেন, কলকাতায় অদ্বৈতাশ্রমে ও স্টুডেন্টস্ হোমে। উনি আজও বলিলেন, বেশ বেশ, ভাল।

সাধু বলিলেন, পুরী থেকে শশী ব্রহ্মচারী পত্রে আপনাকে প্রণাম জানিয়েছেন। শ্রীমহাপুরুষ জিজ্ঞাসা করিলেন — ভাল আছে তো, বেশ বেশ। অনেক ভুগেছে। আমি বলেছি, পুরীতেই থাক, শরীর ভাল থাকুক বা খারাপ থাকুক। জগন্নাথের ধ্যান করতে করতে শরীর যায় যাবে। পুরীতেই থাক। সাধু বলিলেন, আমাকেও আপনার এই আদেশের কথা লিখেছিলেন। মহাপুরুষ আবার বলিলেন, হাঁ, পুরীতেই থাক্ — শরীর যায় যাবে, থাকে থাক্।

১৬ই জুন ১৯৩১ খ্রীস্টাব্দ, মঙ্গলবার।

বেলুড় মঠ। আজ মহাপুরুষ মহারাজের শরীর বিশেষ অসুস্থ, সকালে সাধুগণ প্রণাম করিতে আসেন নাই। বেলা সাড়ে এগারটা। এখন একটু ভাল বোধ করিতেছেন। তাই সেবক রাখালের (স্বামী বৈরাগ্যানন্দের) সাহায্যে বিছানা হইতে উঠিয়া দক্ষিণ-পশ্চিম জানালার কাছে দাঁড়াইয়া শ্রীমহাপুরুষ বাহিরের সব দৃশ্য দর্শন করিতেছেন। মুখমণ্ডল উজ্জ্বল। শরীর অসমর্থ, কিন্তু মন জাগ্রত। মুখমণ্ডল ব্রহ্মদর্শনের আভায় উদ্ভাসিত।

একজন সাধু ঠাকুরঘরের বারান্দায় দাঁড়াইয়া এই দেবদৃশ্য দর্শন করিতেছেন। ভাবিতেছেন, শ্রীমহাপুরুষ কি সর্বভূতে শ্রীভগবানকে দর্শন করিতেছেন?

আজ পায়েস ভোগ হইবে। তাই ঠাকুরের মধ্যাহ্ন ভোজন একটু দেরীতে হইবে।

১৭ই জুন ১৯৩১ খ্রীস্টাব্দ। ২রা আষাঢ় ১৩৩৮, বুধবার।

বেলুড় মঠ। সকাল ছয়টা। মহাপুরুষের ঘর। শ্রীমহাপুরুষ খাটে বসিয়া

আছেন পশ্চিমাস্য। সাধুগণ আসিতেছেন আর প্রণাম করিয়া চলিয়া যাইতেছেন। খুব গরম, তাই মহাপুরুষের শরীর নগ্ন।

একটি সাধু প্রণাম করিলেন। মহাপুরুষ বলিলেন, ভাল আছ? সাধুর বুক পকেট হইতে একটি ব্রাস পড়িয়া গেল মেঝেতে। সাধু উহা উঠাইয়া লইয়া ঘরের বাহিরে চলিয়া গেলেন। মহাপুরুষের সেবক স্বামী গঙ্গেশানন্দ গৃহে প্রবেশ করিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া শ্রীমহাপুরুষ তাঁহার সহিত রঙ্গরস করিতেছেন। বলিলেন, হেগে এলে, হাগা হয়েছে — বৃষ্টিতে? (উচ্চহাস্য)

শ্রীম-র কনিষ্ঠ ভ্রাতা কিশোরী গুপ্ত দেহত্যাগ করিয়াছেন। ইনি ঠাকুরের কৃপাপ্রাপ্ত ভক্ত। শেষ বয়সে এক বাড়িতে একলা থাকিতেন তপস্যার ভাবে। সেইস্থানেই দেহ যায়। তখন কাছে কেহ উপস্থিত ছিল না। কোন ব্যাধিও ছিল না।

অন্তেবাসী শ্রীখোকামহারাজকে এই সংবাদ বলিলেন। খোকা মহারাজ ও কিশোরীবাবু সমবয়সী এবং প্রতিবেশী। প্রথমে বাল্যবন্ধু পরে গুরুভাই। খোকামহারাজ শুনিয়া খুব দুঃখ প্রকাশ করিলেন। আর মহাপুরুষ মহারাজকে জানাইবেন বলিলেন।

আরও বলিলেন, ঠাকুর ভালবাসতেন তাঁকে। ঠাকুর যাদের দীক্ষা দিতেন তাদের জিভে আঙ্গুল দিয়ে লিখে দিতেন বীজমন্ত্র। পল্টু, চুনী, কিশোরী গুপ্ত, কিশোরী রায়, মাস্টার মশায় — এদের সকলের জিভে লিখে দিয়েছিলেন। ভক্তদের — মহিলাদের ভিতর অন্য কারো নয় কেবল মা ঠাকরুনের জিভে লিখে দিয়েছিলেন।

(প্রশ্নের উত্তরে) তুলসী মহারাজ স্বামীজীর কাছে দীক্ষা নিয়েছিলেন। বলরামবাবুর বাড়ির কাছে ওঁদের বাড়ি ছিল। ওখানে ঠাকুরকে দর্শন করেছিলেন। অনেকেই চলে যাচ্ছেন। আমরা দুই বুড়ো এখানে পড়ে আছি এখনও। যাও, এখনই মহাপুরুষকে গিয়ে বল।

শ্রীমহাপুরুষকে বলিলে তিনিও প্রচুর দুঃখ প্রকাশ করিলেন। বলিলেন, একে একে সবাই চলে যাচ্ছেন — যাঁরা ঠাকুরের ভালবাসা পেয়েছিলেন।

ঠাকুরই সত্য আর সব অনিত্য। এ দেহও যাবে। কিশোরীবাবু অনেক বুড়ো হয়েছিলেন। আমাদের সকলেরই আলাপ পরিচয় ওখানেই ঠাকুরের

কাছে। ধন্য কিশোরীবাবু! তিনি ঠাকুরের স্নেহ কৃপা পেয়েছিলেন।

ডায়েরী পাঠ শেষ হইল। শ্রীম বলিলেন, এসব পরে ইতিহাসে স্থান পাবে। শ্রীম কিছুকাল নীরব রহিলেন। শ্রীম-র কনিষ্ঠ ভ্রাতা কিশোরীবাবুর জন্য নূতন করিয়া শোক হইল বুঝি!

স্বামী ধীরাত্মানন্দ অদ্বৈতাশ্রম হইতে আসিয়াছেন। সেখানে কর্ম করেন। শ্রীমকে ঠাকুরের একটি নূতন ফটো উপহার দিলেন। শ্রীম ফটো মাথায় ঠেকাইয়া আনন্দে কথা কহিতেছেন।

শ্রীম — এ ছবিটি খুব ভাল হয়েছে, একেবারে ঠিক। একটি চক্ষু অর্ধনিমীলিত — সমাধির লক্ষণ।

অন্তেবাসী (শ্রীম-র প্রতি) — কোন্ সালে তোলা হয় এটি?

শ্রীম — সম্ভবতঃ এইটিন-এইটিটুতে। শিব মন্দিরের সিঁড়ির উপর ঠাকুর বসা। ভবনাথ এনেছিলেন একজন ফটোগ্রাফার।

স্বামী ধীরাত্মানন্দ — কাশীর প্রমদা মিত্র দিয়েছেন এই ছবিখানা। স্বামীজী তাঁকে উপহার দিয়েছিলেন এ'খানা।

শ্রীম পূর্ণেন্দুর হাতে ছবিখানা দিলেন বাঁধাইতে। একজন নবাগত ভক্ত উহার দাম প্রভৃতি জিজ্ঞাসা করিয়া রসভঙ্গ করিতেছেন। অন্তেবাসী দৃঢ় স্বরে বলিলেন, অদ্বৈতাশ্রম থেকে এ সব জেনে নেবেন।

মুদালিয়ার শ্রীমকে কতকগুলি আপেল উপহার দিলেন।

শ্রীম এইগুলি ঠাকুরের সেবার জন্য ঠাকুরবাড়ি পাঠাইবেন। তিনি ভক্তদের সকলের উপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছেন। একজন ভক্ত বেশ মোটা। তাঁহাকে বলিলেন — ঘোষমশায়, আপনারা বুঝি অনেকদিন ধরে ঠাকুরবাড়ি যান নি? (হাস্য)। ঘোষ মহাশয় উত্তর দিলেন — আজ্ঞে, তিনদিন হল যাই নি। শ্রীম পুনরায় সহাস্যে বলিলেন, তা'হলে একবার যাওয়া উচিত (সকলের হাস্য), এই আপেলগুলি নিয়ে যান।

স্বামী জিতাত্মানন্দের প্রবেশ। তিনি প্রণাম করিয়া বসিলেন।

শ্রীম (স্বামী জিতাত্মানন্দের প্রতি) — বিনয় মহারাজ, চন্দ্র মহারাজের (স্বামী নির্ভয়ানন্দের) খবর কি?

স্বামী জিতাত্মানন্দ — গতকাল দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে গিছলেন নৌকো করে। সঙ্গে অনেক সাধু গিছলেন।

স্বামী নিত্যাত্মানন্দ — আগামী সোমবার শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠে (দেওঘর) যাচ্ছেন।

শ্রীম — দেখ কি মনের জোর! যে ব্যক্তি সম্পূর্ণ অচল, একজনের সাহায্য ছাড়া হাতের একটি অঙ্গুলী ওঠাতে পারেন না, তিনি কত তীর্থ দর্শন করে বেড়াচ্ছেন এই শরীরে। যাদের শরীর সচল, তারাও অত তীর্থ ভ্রমণ করতে পারে না। তাই স্বামীজী বলেছিলেন, 'The spirit is omnipotent' — মনের জোরই আসল কথা।

অন্তেবাসী বলিলেন, তিনি কিশোরীবাবুর দেহত্যাগের কথা খোকা মহারাজ (স্বামী সুবোধানন্দ) ও মহাপুরুষ মহারাজকে (স্বামী শিবানন্দকে) বলিয়াছেন। তাঁহারা অনেক সংবাদ লইলেন।

শ্রীম — হাঁ, তাঁর (ঠাকুরের) সঙ্গে যেটুকু সম্বন্ধ তাই ঠিক। আর সব মিছে — রাবিশ। তবে পাঁকের ভেতর থেকে যেমন পদ্মফুল ফোটে তেমনি এর একটু relative value (আপেক্ষিক মূল্য) আছে। ব্যস্, এই পর্যন্ত। তাঁর (অবতারের) সঙ্গে দেখা এটাই ঠিক, এটাই অমূল্য — এইটুকুই real life (সত্যিকার জীবন)।

স্বামীজী তখন হিমালয়ে। তাঁর একখানা চিঠি দেখেছিলাম। লিখেছেন, ‘আমি এই মায়াপাশ ছিন্নভিন্ন করে ফেলবো।’ সে সময়টা বৃন্দাবনের দিকে একা একা ভ্রমণ করছেন।

উঃ, কি কথা — বীরের ন্যায়! আমি এই মায়াপাশ ছিন্নভিন্ন করে ফেলবো — আর তার ভেতর থেকে বের হয়ে যাব! দিল্লীর ওদিকে গেছেন, সঙ্গে গুরুভাইরা কেউ কেউ। সকলেই তাঁর সঙ্গে থাকতে চান। ‘যা তোরা সব; আমি একা থাকবো’ — এই বলে সবাইকে সরিয়ে দিলেন। একাকী বিচরণ করবেন সিংহের ন্যায়! ঠাকুরও একাকী বেড়াতেন নাটমন্দিরে, যেন প্রদীপ্ত সিংহ! (একজন ভক্তের প্রতি) আচ্ছা, সিংহ বুঝি একলা থাকে? (সহাস্যে) খুদেগুলি সব gregarious (যূথপ্রিয়)।

আজ শ্রীম-র মন বড় একাগ্র, একেবারে যেন জমাটবাঁধা ভাব। স্বামীজীর কথা বলিতে বলিতে যেন সশরীরে প্রত্যক্ষ করিতেছেন সেই বীরকেশরীকে। সচ্চিদানন্দ-সাগরে নিমজ্জমান শ্রীরামকৃষ্ণের ছবিটিকেও

আজ অঙ্কিত করিয়া দিয়াছেন ভক্তহৃদয়ে।

শ্রীম কিছুক্ষণ নীরব, পুনরায় কথা হইতেছে।

শ্রীম (একজন ভক্তের প্রতি) — 'গড্ডলিকা প্রবাহ' একটা আছে জান? ধাড়ী একটা লাফ দিলে। অমনি আর যতগুলি ছিল সবাই দিচ্ছে একটি করে লাফ। লাফ দেওয়ার কোন কারণ ছিল না, তবুও লাফ। অন্যগুলি একবার দেখবেও না, কেন দিচ্ছে লাফ। আগেরটা যেমনি চলেছে তেমনি চললো সব (হাস্য)।

২

স্বামীজী নিত্যসিদ্ধ ঈশ্বরকোটী, মহাত্যাগী মহাপুরুষ। এই বীরকেশরীর এইটিই প্রকৃত স্বরূপ। বাকী সব অবান্তর ঘটনা। স্বামীজীর নিজস্ব রূপটি চক্ষুর সম্মুখে কি বাহির করিয়া ধরিলেন শ্রীম, ঘটনাপুঞ্জের গভীর অরণ্যানী হইতে আনিয়া?

শ্রীম (সকলের প্রতি) — ও দেশে (আমেরিকায়) বরফ পড়ছে। এদিকে fountain dry, ট্যাঁকে পয়সা নেই, গায়ে কাপড় নেই। কি খাবেন তার ঠিক নেই। বসে পড়লেন রেলের একটা ওয়াগনের ভেতর মরণপণ করে। আর একবার বসেছিলেন রাস্তায় ক্ষুধাতৃষ্ণায় পীড়িত হয়ে। তখন বুঝি কে একটি মেম (মিসেস হেল) এসে উঠিয়ে নিয়ে গেলেন তাঁর ঘরে।

তাই গীতায় আছে, — 'পৌরুষং নৃষু'। এই পুরুষকারও শ্রীভগবানের একটি রূপ।

স্বামী রাঘবানন্দ — শাস্ত্রে বলে, পুরুষকারও শেষে যায়। এতেও তাঁকে লাভ হয় না।

শ্রীম — যে পুরুষকার তিনি দেন তাতেই তিনি লভ্য। তাকেই লক্ষ্য করে বলা হয়েছে 'পৌরুষং নৃষু' (গীতা ৭-৮)।

নেপোলিয়ান সমগ্র ফ্রেঞ্চ সাম্রাজ্যের একচ্ছত্র অধিপতি। যা ইচ্ছে তাই করতে পারেন। তিনি বলেছিলেন শেষের দিকে সেন্ট হেলেনাতে, 'ইনি (ক্রাইস্ট) যা যা করলেন তাই থাকবে অনন্ত কাল। আমার কথা কিছুই রইল না আমার জীবিত কালেই।' প্যালেস্টাইনের ম্যাপ দেখিয়ে

বলেছিলেন এই কথাটি — ‘তাঁর (ক্রাইস্টের) কাজই ঠিক’। Abbot's Life of Nepolean-এ আছে এ কথা।

শ্রীম (সকলের প্রতি) — ঠাকুর clearly (স্পষ্ট করে) বললেন কাশীপুর বাগানে, ‘ছেলে জন্মানো আর ঈশ্বরলাভ — এই দু’টোই কি সমান?’ যে পুরুষকার তিনি দেন, কেবল তাতে তাঁকে পাওয়া যায়। এই-ই অর্থ — ‘পৌরুষং নৃষু’র। পুরুষকারের সাম্রাজ্য লাভ হয়। তার নিধনে লাভ হয় ঈশ্বর। ঈশ্বরলাভার্থ পুরুষকার। বীরেশ বিবেকানন্দের সেই পুরুষকার। তাই এই বীরবাণী — ‘আমি মায়াপাশ ছিন্নভিন্ন করে ফেলবো।’

কঠোপনিষদ তাই অত ভালবাসতেন স্বামীজী! বীরেন্দ্র নচিকেতা কিছুই নেবে না। যম যত বলছেন, এটা ন্যাও, ওটা ন্যাও — সাম্রাজ্য, গাড়ী, ঘোড়া, সুন্দরী রমণী, সুবর্ণ, দীর্ঘায়ু — ‘মরণং মানু প্রাক্ষী’। সব প্রত্যাখ্যান করলেন নচিকেতা — বললেন, ‘বরন্তু বরণীয়ঃ স এব’ — কেবল আত্মজ্ঞান চাই। জাগতীয় কিছুই নয় কাম্য।

শ্রীম কি ভাবিতেছেন, আবার কথা কহিতেছেন।

শ্রীম — (একজন ভক্তের প্রতি) — আরুরুক্ষোর্মুনের্যোগং কর্ম কারণমুচ্যতে। যোগারূঢ়স্য তস্যৈব শমঃ কারণমুচ্যতে॥ (গীতা ৬-৩)

কর্মযোগ, যার মন স্থির হয়নি, তার জন্য। যার মন স্থির হয়েছে তার জন্য ধ্যানযোগ। আবার কর্ম করারও কৌশল বলে দিচ্ছেন — ‘মামনুস্মর যুধ্য চ’ (গীতা ৮-৭)। কেবল যুদ্ধের কথা তো বলেন নি। ‘মামনুস্মর’, আমাকে স্মরণ কর সদা। আগে আমার স্মরণ, তারপর যুদ্ধ, কর্ম। একেই বলে কর্মযোগ — কর্মদ্বারা যুক্ত হওয়া তাঁর সঙ্গে। প্রথম স্মরণ, তারপর কর্ম, তারপর আবার স্মরণ ও সমর্পণ। আগে পিছে তাঁর স্মরণ — মাঝখানে কর্ম। এরই নাম কর্মযোগ।

কি বীর স্বামীজী! ঠাকুর বলছেন, ‘নিত্যসিদ্ধ ঈশ্বরকোটি’, ‘সপ্তর্ষির এক ঋষি’, ‘অখণ্ডের ঘর’, ‘আমার শ্বশুরঘর’। দেখ তাঁর জীবন, আগেও সমাধিবান পুরুষ, পরেও তাই। মাঝখানটা কয়েকদিন ঐ করলেন - কর্ম। তাঁর কর্মে আসক্তি নেই, প্রত্যাদিষ্ট কর্ম — লোকশিক্ষার জন্য, জগতের কল্যাণের জন্য। কর্ম তো উদ্দেশ্য নয় — উপায় মাত্র, উদ্দেশ্য ঈশ্বরলাভ।

আহা, কি বীরাগ্রণী — কি বীরবাণী!

(উত্তেজিতভাবে দুই হাতে ছিন্ন করার অভিনয় করিয়া) — 'আমি মায়াপাশ ছিন্ন করে ফেলবো।' এই কথা বলিতে বলিতে শ্রীম নিজকক্ষে প্রবেশ করিলেন।

এখন সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা। সাধুরা ভাবিতেছেন, কোনও কাজে গৃহে প্রবেশ করিয়াছেন। অন্তেবাসী ও স্বামী জিতাত্মানন্দ কহিলেন, আমরাও উঠি, মঠে যেতে হবে। স্বামী রাঘবানন্দ বলিলেন, প্রসাদ নিয়ে যাও। অপেক্ষা কর। তিনি বের হোন।

গৃহমধ্যে শ্রীম বিছানায় ছট্‌ফট করিতেছেন, নিউরালজিক বেদনায়। স্বামী রাঘবানন্দ সকলকে মানা করিলেন ঘরে যাইতে। অন্তেবাসী সবেগে গৃহে প্রবেশ করিয়া হ্যারিকেনের আগুন সেঁক দিতে লাগিলেন। বিনয় মহারাজ (স্বামী জিতাত্মানন্দ) ও স্বামী রাঘবানন্দও ঘরে প্রবেশ করিলেন। ধীরে ধীরে সকলেই গৃহমধ্যে সমাগত — কৃষ্ণ, অমূল্য, সুখেন্দু, যতীন, সতীনাথ, বিষ্ণু, হিমাংশু, অমৃত, মোটা সুধীর, মনোরঞ্জন, ঘোষ মহাশয়, বলাই গুহ, পূর্ণেন্দু প্রভৃতি। তিনতলায় সংবাদ গেল। শ্রীম-র জ্যেষ্ঠপুত্র প্রভাস আসিলেন, সঙ্গে শ্রীম-র দৌহিত্র গোপেন ও লালু আর পৌত্র অরুণ ও অজয়। কয়লার আগুন করিয়া সেঁক চলিতেছে।

অন্তেবাসীর গলা জড়াইয়া যন্ত্রণায় অস্থির শ্রীম। বলিতেছেন আর্তস্বরে, ও জগবন্ধু — ও জগবন্ধু! স্বামী জিতাত্মানন্দকে বলিতেছেন, এখানে সেঁক দাও, ওখানে সেঁক দাও। উহু-হু-উহু-হু। বালকের মতন অতিষ্ঠ। অন্তেবাসী গায়ে মুখে হাত বুলাইয়া বুঝাইয়া বলিতেছেন, এই এক্ষুনি সেরে যাবে। অন্তেবাসী পরিশ্রান্ত, বাহিরে ছাদে গিয়াছেন দুই মিনিট হয়। অমনি ছটফট করিতে করিতে বিছানায় বসিয়া বলিতেছেন — ও জগবন্ধু, এসো না, কোথায় গেলে? তিনি আসিয়া আবার বিছানায় বসিলেন। শ্রীম গলা জড়াইয়া কখনও এ-কাঁধে মাথা রাখিতেছেন, কখনও ও-কাঁধে। সেঁক চলিতেছে। কোনও ঔষধে কাজ হয় নাই। রাত্রি এগারোটা বাজিল। ভক্ত ডাক্তার দুর্গাপদ ঘোষ সংবাদ পাইয়া ছুটিয়া আসিয়াছেন। অদ্বৈতাশ্রমের সাধুরাও আসিলেন।

তিনঘন্টা সমানে সেঁকের পর কিছু উপশম হইল। রাত্রি বারটা। শ্রীম

বলিলেন, একটু ঘুমাবো। সকলে নিচে গেলেন। দুই চারজন মাত্র কাছে রহিলেন। অন্তেবাসী ও বিনয় মহারাজ বেলুড় মঠে যাইতে পারিলেন না। মঠে টেলিফোন করিয়া শ্রীম-র অসুখের কথা জানানো হইল। বিনয় নিত্য শেষ রাত্রে মহাপুরুষ মহারাজের সেবায় উপস্থিত হন। আজ তাহা করিতে পারিলেন না — শ্রীম বিনয় ও জগবন্ধুকে ছাড়িলেন না। তাঁহারা কাছে থাকিলে বুঝি প্রসন্ন হন। শ্রীম রাত্রিতে কিছু আর আহার করিলেন না। সাধুদের প্রভাসবাবু আহার করাইলেন। শ্রীম-র কক্ষে শুইলেন যতীন ও বলাই। সিঁড়ির ঘরে স্বামী রাঘবানন্দ ও স্বামী জিতাত্মানন্দ। আর দোতলায় সিঁড়ির পূর্ব পাশের বসিবার ঘরে শুইলেন স্বামী নিত্যাত্মানন্দ। পরদিন ভোর চারিটায় উপরে গিয়া অন্তেবাসী দেখিলেন, শ্রীম গভীর নিদ্রায় মগ্ন।

সকালে অন্তেবাসী গেলেন শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন স্টুডেন্টস্ হোমে ৭ নম্বর হালদার লেনে। তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠের কর্মী। আজই সেখানে রওনা হইবার কথা। বিদ্যাপীঠের অনেকগুলি বিদ্যার্থীও যাইবে। অন্তেবাসীর ইচ্ছা আরও দুই চার দিন পরে যান, শ্রীমকে সম্পূর্ণ সুস্থ দেখিয়া। স্বামী বোধাত্মানন্দ বলিলেন, টিকিট সব কেনা হয়েছে। অন্তেবাসীকেও যেতে হবে। তিনি পুনরায় শ্রীম-র কাছে মর্টন স্কুলে আসিলেন। শ্রীম তখন দৈনিক 'অমৃত বাজার পত্রিকা' পড়িতেছেন। অন্তেবাসী শ্রীমকে প্রণাম করিয়া বলিলেন, বিদ্যাপীঠে যেতে হবে। শ্রীম বলিলেন, আজই তোমাদের যেতে হবে? ক'টায় গাড়ী? 'দশটায়' বলায় পুনরায় বলিলেন, ও-ও যেতেই হবে। আচ্ছা, তবে এসো।

বেলুড় মঠের শ্রীমহাপুরুষ মহারাজের ঘর। এখন বেলা নয়টা। মহাপুরুষ মহারাজ খাটে বসা। সেবক শৈলেশ মেঝেতে বসিয়া 'স্টেট্‌সম্যান' দেখিতেছেন। অন্তেবাসী গৃহে প্রবেশ করিতেই মহাপুরুষ মহারাজ বলিলেন শৈলেশকে, শোন কি বলে (শ্রীম-র অসুখের কথা)। সব শুনিয়া মহাপুরুষ মহারাজ বলিলেন — যা, মাস্টার এ যাত্রায় বেঁচে গেলেন — হাঁ, এবার বেঁচে গেলেন।

সম্মুখস্থ দেয়ালে বিলম্বিত ঠাকুরের ছবিকে যুক্ত করে চক্ষু বুজিয়া প্রণাম করিতেছেন। অন্তেবাসী ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিলেন। বলিলেন, দেওঘর

যাব এখন। তিনি আনন্দে মাথা নাড়িয়া বলিলেন, যাও — ভাল।

১০টা ২৪ মিনিটে গাড়ী ছাড়িল। অনেকগুলি বিদ্যার্থী, সঙ্গে স্বামী বোধাত্মানন্দ ও ব্রহ্মচারী অমূল্য। ব্রহ্মচারী যতীনও আজ নূতন বিদ্যাপীঠে সেবকরূপে যাইতেছেন।

অন্তেবাসী গাড়ীতে বসিয়া শ্রীম-র অসুখের কথা ভাবিতেছেন। অত বড় অসুখটা গেল, কিন্তু কর্মের কি বক্র গতি। এঁকে ছেড়ে যেতে হচ্ছে। যিনি মায়ের মত ধর্মজীবনের জন্ম দিয়েছেন এবং সুদীর্ঘকাল পালন করেছেন তাঁকে অসুস্থ রেখে যেতে হচ্ছে কর্মস্থলে। বিচিত্র ব্যাপার এ জগতের! ‘গহনা কর্মণো গতিঃ’ (গীতা ৪-১৭)। শ্রীম-র কথা ভাবিয়া এক একবার বিষণ্ণ হইতেছেন। এক একবার সব ভাবনা ঠাকুরে সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত ও আনন্দিত হইতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠ, দেওঘর (বিহার)।
২০শে জুন ১৯৩১ খ্রীস্টাব্দ। ৫ই আষাঢ় ১৩৩৮ সাল, শনিবার।